হয়। অপরের মতে সবই Solar myth, অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র আকাশ তারা বৃষ্টি ইত্যাদি বাহ্য প্রকৃতির ক্রীড়াকে কবিকল্পিত নামরূপে সাজাইয়া মনুষ্যাকৃতি দেবতা করা হইয়াছে। বৃত্র মেঘ, বলও মেঘ, আর যত দস্যু দানব দৈত্য আকাশের মেঘ মাত্র, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র এইসকল সূর্য্যকিরণের অবরোধকারী জলবর্ষণে বিমুখ কৃপণ জলধরকে বিদ্ধ করিয়া বৃষ্টিদানে পঞ্চনদের সপ্তনদীর অবাধ স্রোতঃ-সৃজনে ভূমিকে উর্ব্বরা, আর্য্যকে ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তোলেন। অথবা ইন্দ্র মিত্র অর্য্যমা ভগ বরুণ বিষ্ণু সবাই সূর্য্যের নামরূপ মাত্র, মিত্র দিনের দেবতা, বরুণ রাত্রির, ঋতুগণ যাঁহারা মনের বলে ইন্দ্রের অশ্ব, অশ্বিদ্বয়ের রথ নির্মাণ করেন, তাঁহারাও আর কিছুই নন, সূর্য্যের কিরণ। অপরদিকে অসংখ্য গোঁড়া বৈদিকও ছিল, তাহারা কর্ম্মকাণ্ডী ritualist। তাহারা বলে দেবতা মনুষ্যাকৃতি দেবতাই বটে, প্রাকৃতিক শক্তির সর্ব্বব্যাপী শক্তিধরও বটে, অগ্নি একসময়েই বিগ্রহবান দেবতা এবং বেদীর আগুন, পার্থিব অগ্নি, বাড়বানল ও বিদ্যুৎ এই তিন মূর্ত্তিতে প্রকটিত, সরস্বতী নদীও বটে দেবীও বটে ইত্যাদি। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দেবতারা স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে স্বর্গদান, ইহলোক বল, পুত্র, গাভী, অশ্ব, অন্ন ও বস্ত্র দান করেন, শত্রুকে সংহার করেন, স্তোতার বেআদবী নিন্দুক সমালোচকের মাথা বজ্রাঘাতে চূর্ণ করেন, ইত্যাদি শুভ মিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হন। প্রাচীন ভারতে এই মতই প্রবল ছিল।

তথাপি এমন চিন্তাশীল লোকের অভাব ছিল না যাঁহারা বেদের বেদত্বে, ঋষির প্রকৃত ঋষিত্বে আস্থাবান ছিলেন, ঋকসংহিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতেন, বেদে বেদান্তের মূল তত্ত্ব খুঁজিতেন। তাঁহাদের মতে ঋষিরা দেবতার নিকট যে জ্যোতির্দ্দান প্রার্থনা করিতেন, সে ভৌমিক সূর্য্যের নয়, জ্ঞান-সূর্য্যের, গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত সূর্য্যের, বিশ্বামিত্র যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই জ্যোতি সেই "তৎসবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ" এই দেবতা ইনি, "যো নো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ" যিনি আমাদের সকল চিন্তা সত্যতত্ত্বের দিকে প্রেরিত করেন। ঋষিরা তমঃ ভয় করিতেন–রাত্রির নহে, কিন্তু অজ্ঞানের সেই ঘোর তিমির। ইন্দ্র জীবাত্মা বা প্রাণ; বৃত্র মেঘও নয়, কবিকল্পিত অসুরও নয়–যাহা আমাদের পুরুষার্থকে ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করিয়া রোধ করে, যাহার মধ্যে দেবগণ অগ্রে নিহিত ও লুপ্ত হইয়া, (পরে) দেববাক্যজনিত উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে নিস্তারিত ও প্রকট হন, তাহাই বৃত্র। সায়নাচার্য্য ইহাদের "আত্মবিদ" নামে অভিহিত করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের বেদব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আত্মবিদ্‌কৃত ব্যাখ্যার দৃষ্টান্তস্বরূপ রাহূগণ পুত্র গোতম ঋষির মরুৎস্তোত্র (উল্লেখ) করা যায়। সেই সূক্তে গোতম মরুদ্‌গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট "জ্যোতি" ভিক্ষা করিয়াছেন–

যূয়ং তৎ স্যশবস আবিষ্কর্ত্ত মহিত্বনা
বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ ॥
গূহতা গুহ্যং তমো বিঘাত বিশ্বমত্রিণম্
জ্যোতিষ্কর্ত্তা যদুশ্মসি ॥ ১-৮৬-৯.১০

কর্ম্মকাণ্ডীদের মতে এই ঋক্‌দ্বয়ের ব্যাখ্যায় জ্যোতিকে ভৌতিক সূর্য্যেরই জ্যোতি বুঝিতে হয়। "যে রক্ষঃ সূর্য্যের আলোককে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, মরুদ্‌গণ সে রক্ষকে বিনাশ করিয়া সূর্য্যের জ্যোতি পুনঃ দৃষ্টিগোচর করুন।" আত্মবিদের মতে অন্যরূপ অর্থ করা উচিত, যেমন, "তোমরা সত্যের বলে বলী, তোমাদের মহিমায় সেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হোক, তোমাদের বিদ্যুৎসম আলোকে রক্ষকে বিদ্ধ কর। হৃদ্‌রূপ গুহায় প্রতিষ্ঠিত অন্ধকার গোপন কর, অর্থাৎ সেই অন্ধকার যেন সত্যের আলোকবন্যায় নিমগ্ন, অদৃশ্য হইয়া যায়। পুরুষার্থের সকল ভক্ষককে অপসারিত করিয়া আমরা যে জ্যোতি চাই, তাহা প্রকটিত কর।" এখানে মরুদ্‌গণ মেঘহন্তা বায়ু নহেন, পঞ্চপ্রাণ। তমঃ হৃদয়গত ভাবরূপ অন্ধকার, পুরুষার্থের ভক্ষক ষড় রিপু, জ্যোতিঃ পরম তত্ত্বসাক্ষাৎরূপ জ্ঞানের আলোক। এই ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মতত্ত্ব, বেদান্তের মূলকথা, রাজযোগের প্রাণায়াম প্রণালী একযোগে বেদে পাওয়া গেল।

এই গেল বেদে স্বদেশী বিভ্রাট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কোমর বাঁধিয়া আসরে নামায় এই ক্ষেত্রে ঘোরতর বিদেশী বিভ্রাটও ঘটিয়াছে। সেই বন্যার বিপুল তরঙ্গে আমরা আজ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাইয়া ভাসিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন নিরুক্তকার ও ঐতিহাসিকদের পুরোনো ভিত্তির উপরেই নিজ চকচকে নব কল্পনামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা যাস্কের নিরুক্ত তত মানেন না, বালিন ও পেত্রগ্রাদে নবীন মনোনীত নিরুক্ত তৈয়ারি করিয়া তাহারই সাহায্যে বেদের ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় টীকাকারদের Solar myth-এর বিচিত্র নবমূর্তি বানাইয়া, প্রাচীন রঙের উপর নূতন রং ফলাইয়া এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়াছেন। এই য়ুরোপীয় মতেও বেদোক্ত দেবতা বাহ্য প্রকৃতির নানা ক্রীড়ার রূপক মাত্র। আর্য্যেরা সূর্য্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র ঊষা রাত্রি বায়ু ঝাটিকা খাল নদী সমুদ্র পর্ব্বত বৃক্ষ ইত্যাদি দৃশ্যবস্তুর পূজা করিতেন। এই সকলকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত বর্ব্বর জাতি এইগুলির বিচিত্র গতিকে কবির রূপকচ্ছলে স্তব করিত। আবার তাহারই মধ্যে নানা দেবতার চৈতন্যময় ক্রিয়া বুঝিয়া সেই শক্তিধরের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ও তাঁহাদের নিকট যুদ্ধে বিজয়লাভ ধনদৌলত দীর্ঘজীবন আরোগ্য ও সন্ততি কামনা করিতেন, রাত্রির অন্ধকারে বড় ভীত হইয়া যাগযজ্ঞে সূর্য্যের পুনরুদ্ধার করিতেন। ভূতেরও আতঙ্ক ছিল, ভূত তাড়াইবার জন্য দেবতার নিকটে কাতরোক্তি করিতেন। যজ্ঞে স্বর্গলাভের আশা ও প্রবল (ইচ্ছা) ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরের উচিত ধারণা ও কুসংস্কার।

যুদ্ধে বিজয়লাভ, যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? ইহারা বলেন, পঞ্চনদনিবাসী আর্য্যজাতির সময় আসল ভারতবাসী দ্রাবিড়জাতির সঙ্গে, আর প্রতিবেশীদের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ সতত ঘটিয়া আসে, সেই আর্য্যতে আর্য্যতে ভিতরের কলহ। যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিক

*(পরবর্তী অংশ ১১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# বিজয়া দশমীর মাহাত্ম্য

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়া দশমী আর দশেরা সম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ বলে দশেরা, কেউ দশহারা, কেউ বা বলে নবরাত্রি দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসব হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রাচীন উৎসব। ভারতবর্ষে এই উৎসব আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ইংরেজি মাসের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আয়োজিত হয়। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদে শুরু হয়ে এই পুজো, চলে দশমী পর্যন্ত। শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বিদেশেও এই উৎসব পালিত হয়। নেপালে এই উৎসবটি জাতীয় উৎসব।

নবগ্রহের যেমন নয়টি গ্রহ যথা– রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু, ঠিক একইভাবে মানুষের শরীরেও নবদ্বার আছে। যেমন– দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, মলদ্বার, প্রস্রাব দ্বার। এই নবদ্বার যদি ঠিকঠাক চলে, তবেই মানুষ সুস্থ থাকবে।

দশেরা অর্থাৎ নবরাত্রি, এর প্রথম নয় দিন মা দুর্গাকে পুজো করা হয় নানাভাবে। শক্তির আরাধনা চলতে থাকে। অতঃপর দশম দিনে মাকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। তারপর মাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। আসছে বছর আবার এসো, এই বলে তাঁকে আবাহন জানানো হয়। শুরু হয় সকল বিভেদ ভুলে একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে মিষ্টিমুখ করা। দশমীর এই আনন্দ চলতে থাক লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত। সকলেই এই উপলক্ষে একতার মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

উপনিষদে আছে 'মাতৃদেব ভব'। অর্থাৎ নারীই পরিবারের অভিভাবক। মাতৃজাতি তথা নারী জাতিকে সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। যখনই সংসারে কোনও সমস্যা আসে, নারী তার সকল শক্তি দিয়ে রক্ষা করে। মানবিকতা, ন্যায় বিচার, ভালোবাসা, সেবা দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করে। মা দুর্গার পুজোতে নারী জাতিও উদ্বুদ্ধ হয়। মা যেমন পরিবারকে সঙ্গে আনেন এবং শত্রু বিনাশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তারাও তেমনই তাদের পরিবারকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রেখে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

নবগ্রহের যেমন নয়টি গ্রহ যথা– রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু, ঠিক একইভাবে মানুষের শরীরেও নবদ্বার আছে। যেমন– দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, মলদ্বার, প্রস্রাব দ্বার। এই নবদ্বার যদি ঠিকঠাক চলে, তবেই মানুষ সুস্থ থাকবে।

নবরাত্রি মানে নয়টি রাত্রি, যা নয়টি গ্রহের পরিচালনায় ঠিক মতো চালিত করতে পারে। শুধুমাত্র দুর্গাপূজোর বাহ্যিক আড়ম্বরই নয়, মনের অন্তর থেকে দেবীকে পুজো করে প্রতিটা গ্রহের প্রভাবে যেন ঠিকভাবে শরীর চালিত হয়, সেই প্রার্থনা করা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই দুর্গোৎসব পালিত হয় বিভিন্নভাবে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হারিয়ানা, দিল্লি, মহারাষ্ট্রের কয়েকটি জায়গায় নবরাত্রিতে রামের পুজো হয়। রামায়ণকে কেন্দ্র করে নাচ, গান, নাটক চলতে থাকে ন'দিন। অবশেষে দশেরার দিন রাবণের কুশপুত্তলিকা জ্বালানো হয়। সমস্ত ধ্বংসকারীর বিনাশ স্বরূপ এই পুত্তলিকা জ্বালানো হয়। বাংলা, আসাম, ওড়িশায় দুর্গা আসেন সপরিবারে। দশমী'র দিন তিনি বিদায় নেন। আর মর্ত্যবাসী বলে, 'আবার এসো মা'। ❑

# আমরা সনাতনী

ড. কাঞ্চন পুরোহিত

জন্মসূত্রে আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। এটা বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলোর একটি। এর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা এই ধর্মমতকে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকিয়ে রেখেছে।

এসব বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্ত করার জন্য ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এর প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

(১) ঈশ্বরের একত্ব (Unity of God): যার মূলমন্ত্র হলো– ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এই মহাশক্তিকে আরাধনা করা এবং সেই সর্বশক্তিমানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করাই সনাতন ধর্মের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন মুনি ঋষিগণ বিভিন্নভাবে আরাধনা করে সেই পরমব্রহ্মকে লাভ করেছেন।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এই মহাশক্তিকে আরাধনা করা এবং সেই সর্বশক্তিমানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করাই সনাতন ধর্মের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন মুনি ঋষিগণ বিভিন্নভাবে আরাধনা করে সেই পরমব্রহ্মকে লাভ করেছেন।

(২) বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি (Flexible and Diverse Prayer System): সনাতনী ধর্মচর্চায় সাকার-নিরাকার, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি চালু আছে। সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে নিজের মত করে উপাসনা করবে। এটা যেন একই লক্ষ্যে একাধিক নদীপথ। এসব বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিকে পরমহংসদেব একই পুকুরের বিভিন্ন ঘাটের সাথে তুলনা করেছেন। তাই এই সনাতনী মহাপুরুষের মুখে ধ্বনিত হয়েছে– "যত মত তত পথ"। কিন্তু মূর্খরা একে একাধিক ঈশ্বরের উপাসনা বলে সমালোচনা করেন। তারা সনাতনী ধর্মচর্চায় "Flexibility" ও "Diversity"–কে বুঝতে অক্ষম।

(৩) প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল (Respect to Environment): আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তাই এই বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছুতেই ঈশ্বরের প্রকাশ। সনাতনীরা প্রকৃতির সব উপাদান যেমন– পশু-পাখি, গাছপালা, নদ-নদী যা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে তা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। এভাবে প্রতিটি হিন্দু জন্ম থেকে একজন পরিবেশবাদী। সনাতন ধর্ম দর্শনের মধ্যেই বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ সংকটের সমাধান নিহিত। হিন্দুরা বিশ্বাস করে পরিবেশকে ধ্বংস করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়।

(৪) ধর্মচর্চায় স্বাধীনতা (Freedom to Religious Practice): আমাদের ধর্মচর্চায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই, আপনি দৈনিক ত্রি-সন্ধ্যা (উপাসনা) করতে পারেন। আবার সুযোগ না থাকলে যখনই সময় পাবেন তখনই ঈশ্বরকে স্মরণ করুন। মূল বক্তব্য হলো ঈশ্বরকে স্মরণ করুন– যখনই সম্ভব, যেভাবে সম্ভব। ঈশ্বরকে ডাকতে গিয়ে অন্যের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাই আমাদের মধ্যে নিয়মভঙ্গের কোন অপরাধ বোধ নেই। তবে এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে আপনি যদি ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়েন, এটা আত্মহত্যার সামিল।

(৫) বর্ণপ্রথা ও অপপ্রয়োগ (Misuse of Caste System): গীতায় বলা হয়েছে গুণ ও কর্মভেদে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি শুধুই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নয়। জন্মসূত্রে আমরা সবাই মানুষ। কিন্তু গতানুগতিকভাবে এই প্রথা বৃহত্তর হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে। খুব ধীরে হলেও বর্ণপ্রথার অপপ্রয়োগ কমে আসছে। এর জন্য ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। তবে এই ভূমিকা আরো জোরালো হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেকে এক একজন সংস্কারক হিসেবে এই অপব্যাখ্যা রোধ করতে পারি।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আমরা প্রবাসী সনাতনীরা একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যে তা জাগিয়ে তুলতে হবে। এর জন্য শুধু একটু সচেষ্ট হওয়া দরকার, যদি মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে সাপ্তাহিক অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছুক্ষণ নাম-কীর্তন করুন। এর জন্য কোন ব্রাহ্মণ বা গুরুর প্রয়োজন হয় না। এটা আপনাকে এক অদ্ভুত প্রশান্তি দেবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে– "আমার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমার নিজের।" ❑

# বিবেকানন্দের প্রাণপ্রিয় বেলুড় মঠ : শিবভূমি মুক্তিতীর্থ

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

বেলুড় মঠ তথা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর আত্মারাম শিবস্বরূপ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজ-স্কন্ধে বহন করে এনে বেলুড় মঠ তথা সর্বধর্ম সমন্বয় ক্ষেত্র এই জাগ্রত-মুক্তিতীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা সহধর্মিনী সারদামণি— যিনি স্বামীজী কথিত 'জ্যান্তদুর্গা', তিনিও অধিষ্ঠিত। কাজেই বেলুড় মঠ প্রকারান্তরে হর-পার্বতীর লীলাক্ষেত্র। মা সারদামণি যখন বেলুড় মঠে বাস করতেন, তখন প্রতি সোমবার সকালে বেলুড়ের কাছে বালি অঞ্চলে কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দিতেন। অথবা অন্য কারও মারফত পুজো পাঠাতেন। সে ধারা আজও অব্যাহত রেখেছেন এখানকার সাধু-ব্রহ্মচারীরা। এই শিব খুবই জাগ্রত বলে কথিত। এই বেলুড় মঠেই (নীলাম্বরবাবুর বাগানে) একবার শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে কাতরা মা সারদামণি পার্বতী-সতীর মতোই কঠোর পঞ্চতপা ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন, বিরহানল উপশমের জন্য।

আমরা জানি, প্রাচীনকালে হিমালয় শিবের আবাসস্থল বলে কথিত হত। হিন্দুদের স্মরণে-মননে এখনও তাই হিমালয় এক মুক্তিতীর্থ— কৈলাসভূমি। স্বামীজী বারবার ছুটে গিয়েছেন হিমালয়ে, নিজের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য। এই হিমালয়েরই অমরনাথ তীর্থে স্বামীজী তুষারলিঙ্গ শিবের কাছে ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন। এই হিমালয়েই স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করেছেন মিশনের অন্যতম এক কেন্দ্র মায়াবতী আশ্রম, যেখানে প্রতি বছর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুগামীরা ছুটে আসেন এই ত্যাগভূমির মাহাত্ম্য উপলব্ধির জন্য। স্বামীজীর এত হিমালয়-প্রীতি ও শিবানুরাগের কারণ, তাঁর জন্ম-কর্ম সবই শিবাংশে। কথিত আছে, তাঁর মা ভুবনেশ্বরীদেবীর কঠোর ব্রত উপবাস ও তপস্যার দ্বারাই তাঁর প্রথম পুত্রলাভ। নাম রেখেছিলেন তাই বীরেশ্বর— শিব, ভালো নাম 'নরেন্দ্রনাথ'। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দেবসত্তা। অখণ্ডের ঘরের এক ঋষির মর্ত্যে আগমন হয়েছে বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর 'হাতের যন্ত্র' ধরে বিশ্বব্যাপী এক নূতন আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সব ধর্মের গোঁড়ামি ভেঙে দিয়ে। সর্বধর্ম সমন্বয়কারী এই নতুন যুগে এই নতুন দেবতারই বাণীবাহক-প্রচারক নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় মহাশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ।

বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের শাখা-প্রশাখা প্রবাহিত হলেও প্রাণকেন্দ্র কিন্তু বাংলার বেলুড় মঠ— যেখানে স্বয়ং স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদরা বাস করেছেন এবং নিজেদের ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা এই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন।

স্বামীজীর সারা ভারতে নিঃসম্বল পরিব্রাজক হিসেবে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর জীবনের অন্যতম ঘটনা হল, তিনি দাক্ষিণাত্যে শৈবতীর্থ রামেশ্বরমে এই যাত্রা শেষ করেন। রামায়ণের রামচন্দ্রের মতোই তিনি শিবপুজো করে পাশ্চাত্য যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। ওপারেই শ্রীলঙ্কা, তারপরেই পশ্চিমের ভূখণ্ড। তবে স্বামীজীর এই যাত্রা শ্রীরামচন্দ্রের মতো সাগর পেরিয়ে রাবণ বধের সংগ্রামের জন্য নয়। তাঁর এই যাত্রা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনসেতু রচনা করা। হিন্দুধর্মে তথা সর্বধর্ম সম্মেলনে এরপরেই তিনি যোগ দেন ভারতমাতার পুনর্জীবনের জন্য এবং বিশ্বের দরবারে বেদান্তের বাণী শোনাতে।

বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের শাখা-প্রশাখা প্রবাহিত হলেও প্রাণকেন্দ্র কিন্তু বাংলার বেলুড় মঠ— যেখানে স্বয়ং স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদরা বাস করেছেন এবং নিজেদের ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা এই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তার কতিপয় পার্ষদ নিজেদের ত্যাগ-বৈরাগ্য-তপস্যার দ্বারাই এই সংঘের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। তখন তাঁদের দিবানিশি মন্ত্র ছিল 'শিবগুরু'— অর্থাৎ সেখানে তাঁদের গুরু ও শিব এক সত্তা অর্থাৎ পরিপূর্ণ ত্যাগের মহিমা সেখানে বিরাজিত। কোনও দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়, কঠোর তপস্যা, ধ্যান-ধারণাই তাঁদের তখন অবলম্বন। শিবের মতো তারা মাঝে মাঝে বিভূতি ভূষিতাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকতেন। ভিক্ষান্নে যা জোটে তাতেই তাঁদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি। এরই মধ্যে তাঁরা একদিন প্রেমানন্দজীর জন্মস্থানে, যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে সন্ন্যাস নেন। তখন নরেন্দ্রনাথকে সুন্দর গেরুয়াবসনে সাক্ষাৎ শিব বলে মনে হত। বসনের সৌন্দর্যে চোখ-মুখের এক অপূর্ব কান্তি ফুটে উঠেছিল। এই সময়েরই কিছু আগে এক শিবরাত্রির দিনে বরাহনগর মঠে (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭) স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের নিয়ে আনন্দে একটি স্বরচিত গান গাইতে থাকেন। সেই পরিমণ্ডলে তখন তাঁকে শিব ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা যায় না। গানটি—

'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা ববম বাজে গান,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে কপাল মাল,
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল ॥'

এইরকম ত্যাগ-তপস্যার মাঝেই স্বামীজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদরা সংঘশক্তিকে এক দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আজ যে-শক্তি নানা কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিশ্বব্যাপী সক্রিয়, তা কিন্তু সর্বশিবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয় পার্ষদদের ত্যাগ-তপস্যার প্রভাবেই। উত্তরকালে তাঁদের পতাকাবাহীরা সেই

মহান আদর্শ অনুশীলনে সচেষ্ট। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের একটি সুন্দর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণদেব] যে দৈববীজ কোন দিকে না তাকাইয়া বাংলার মাটিতে ফেলিয়া দিয়ে গেলেন, তাহাকে অঙ্কুরিত করিল নরেন্দ্রনাথ [স্বামী বিবেকানন্দ] আর তারপর লালিত পালিত, বর্ধিত ও ফলবন্ত করিয়াছে নরেন্দ্র স্থাপিত সম্প্রদায়। জগতের ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ সঙ্ঘ গঠনের ফলেই ঈশ্বর-প্রেরিত পূত অগ্নিশিখা নিভিতে পারে না, সাধকগণ তাঁকে চিরপ্রজ্বলিত করিয়া রাখে।"

এই দৈববীজ নিঃসন্দেহে ত্যাগ-বৈরাগ্যমণ্ডিত। এই পরিমণ্ডলে নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের ভূমিকাই প্রধান। তিনি 'মূর্ত-মহেশ্বর' অর্থাৎ সাক্ষাৎ সচল শিব। একবার হিমালয় ভ্রমণকালে বহু যাত্রীর মধ্যে স্বামীজীকে দেখে জনৈক ভিনদেশী সন্ন্যাসী আনন্দে বলে উঠেছিলেন— 'শিব'। সেবার সম্ভবত মানস কন্যা নিবেদিতা ও কয়েকজন পাশ্চাত্য সহযাত্রীও ছিলেন। এই ঘটনার কথা জেনে পরবর্তীকালে তাঁর জীবনীকার নোবেল বিজয়ী রমারঁলা মন্তব্য করেছিলেন— "স্বামীজীর আরাধ্য দেবতাই তাঁর ললাটে ওই নামটি লিখেছিলেন। তা না হলে পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তি উড়িয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে এসে আবার সেই ত্যাগব্রতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন! সন্ন্যাসীর কৌপীন ও গেরুয়া বস্ত্র তাঁর সম্বল হল এবং স্বামীজী অনুগামীদের নিয়ে সাধনভজন ও জীবসেবা তথা সমাজসেবায় ব্রতী হলেন। দুর্ভিক্ষে কলকাতায় প্লেগ মহামারীতে এই সচল শিবরূপী মহাপুরুষের কথা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

### একালে বেলুড় মঠের শিবরাত্রি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত শিবচতুর্দশীব্রত পালন বেলুড় মঠে আজও অব্যাহত। এর মাধ্যম সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হোম, পূজা ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠান। আজও স্বামীজীর বাড়ির সংলগ্ন আমগাছতলায় (যে আম গাছটি স্বামীজী দেখে গিয়েছেন ও আজও জীবিত এবং ফলবন্ত) হোম করা হয়। তারপর মঠের মন্দিরে শিবপূজা প্রহরে প্রহরে সারা রাত ধরে। এই সময় বিশেষ আর্কষণীয় একজন ব্রহ্মচারী শিব ও অন্য দু'জন নন্দীভৃঙ্গী সেজে উপস্থিত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের সুনিপুণ নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ দেন 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনিতে। হোম ছাড়া সবই মূল-মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় একালে।

বেলুড় মঠে শিবচতুর্দশীর কয়েকদিন পরে গভীর রাতে বিশেষ অনুষ্ঠান নবীন ব্রহ্মচারীদের ব্রহ্মচর্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন সংঘগুরু পরম পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের কাছ থেকে। ঊষাকালে সন্ন্যাসীর কৌপীন ও নতুন গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করে এইসব ত্যাগব্রতী নবীন সন্ন্যাসীরা। নবজীবনের শুরুতে সকলেরই কণ্ঠে শিব গুরুর জয়ধ্বনি— 'জয় শিব শঙ্কর! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।' এরপর নবীন সন্ন্যাসীরা শ্রীমায়ের ঘাটে গিয়ে দণ্ডী ভাসান গঙ্গায় পুণ্যস্নান করে। মুখে শুধুই সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিবের জয়ধ্বনি— 'হর হর মহাদেব। জয় গুরু মহারাজের জয়।'

এই ঊষাকালেই সংঘগুরুর বাসস্থানে গিয়ে একে-একে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে আশীর্বাদ গ্রহণ ও সন্ন্যাসজীবনের নতুন নাম গ্রহণ এবং তাঁদের পরবর্তী জন্মে উত্তরণ।

এইদিন মধ্যাহ্নকাল থেকেই পরবর্তী তিন দিন ভিক্ষাবৃত্তি বেলুড় মঠের সীমানার বাইরে গিয়ে প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ 'ওঁ নমো নারায়ণ' বলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। এই অনির্বচনীয় আনন্দের রেশ নবীন সন্ন্যাসীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। ত্যাগধর্মের মহিমা অপার। 'হর হর মহাদেব।' 'জয় শ্রীগুরু মহারাজ'। ❑

যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টো দ্বন্দ্ব-অতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে ॥
*[ অ : ৪, শ্লোক : ২২ ]*

অনুবাদ : যিনি বিনাচেষ্টাতেই যা প্রাপ্ত হন তাতেই তুষ্ট, যিনি সুখ-দুঃখ, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করেন তিনি কর্ম করেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না ॥
*[ অ : ৪, শ্লোক : ২২ ]*

# রীতিনীতি-আচরণে দুর্গাপূজার সেকাল ও একাল

গৌরী দে

পুরাণ-উপপুরাণ অনুসারে শরৎকালে রামচন্দ্র রাবণ বধের আশায় যে পূজা করেছিলেন সেটাই অকাল বোধন। দক্ষিণায়নে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। শরৎকালে শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত এই কাল। তাই দেবীকে জাগ্রত করতে রামচন্দ্রকে অকাল বোধন করতে হয়। জয়লাভের জন্য তিনি দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হন। কেননা, দেবী পাপ, ভয়, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, শত্রু থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন। দুর্গা শব্দ ভাঙলে হয়—

দ— দৈত্যনাশক
উ— বিঘ্ননাশক
রেফ— রোগাঘ্না
গ— পাপঘ্ন
আ— ভয় শত্রুঘ্ন

কিন্তু সবকিছুর ওপরে দেবী আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের মা। বাংলায় ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা কংসনারায়ণ দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। আশ্বিনী শুক্লাপক্ষের ষষ্ঠীর দিন কল্পারম্ভ ও বোধন হয়। তারপর আমন্ত্রণ, তারপর অধিবাস। নিয়ম মেনে চলত পূজা। কাশীপুর রাজবাড়িতে সন্ধিপূজার সময় কামান দাগা হত। সেই মুহূর্তে হত মহিষ বলি। নবমী পূজার পর নানাজনের মানত রাখতে শ'য়ে শ'য়ে হ'ত ছাগবলি। গ্রামেও চলত বলি, মন্দিরের সামনে রাখা হ'ত হাড়িকাঠ। আগমনির গান শোনা যেত চারিদিকে।

> বিজয়ার পর প্রণাম প্রায় নেই বললেই চলে। সময়ের অভাব, ইচ্ছার অভাব, ব্যস্ততার অজুহাতে ফোনেই সব সারা হয়। কেউ কারও বাড়ি মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে এমন উদাহরণ কম। কারণ সেই আন্তরিকতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

মা আসছে— প্রকৃতি যেন নতুন করে সেজে উঠত। ঘরে ঘরে চলত জামাকাপড় কেনার উৎসাহ। বাউলের সুরে, চাষার গানে, মাঝির গলায় ফুটে উঠত আনন্দের সুর। শরতে সাদা মেঘ, মাঠে কাশ ফুলের ঢেউ; শিউলি ফুলের গন্ধ জানিয়ে দিত মা আসছেন সারা বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে। গ্রামের মন্দিরগুলোর সংস্কার শুরু হয়ে যেত। শহরের বড়বড় জমিদার বাড়ি বা আমলাদের বাড়ির ঠাকুরদালানে পড়ত নতুন করে রঙের আঁচড়। কারণ তখনও বারোয়ারি পূজার চল ছিল না। জন্মাষ্টমীর দিন থেকে শুরু হ'ত কাঠামো পূজা। কুমাররা এসে ঠাকুরদালানে বসে দুর্গা প্রতিমা গড়তেন। এক চালার মধ্যে থাকতেন মা দুর্গার পরিবার— আর চালচিত্রের মাথায় থাকত শিবের ছবি। রাজবাড়িতে মহালয়া থেকেই শুরু হয়ে যেত চণ্ডীপাঠ। ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ হ'ত দেবীমাহাত্ম্য। ঢাকের বাদ্যে সানাইয়ের সুরে গমগম করত চারদিক। সেই শব্দে ছুটে আসত পাড়ার বউ ঝি ছেলেমেয়ের দল।

একালে— বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুমোরটুলিতে অর্ডার দেওয়া প্রতিমা। এককাঠামো নয়, বিভিন্ন কাঠামো আর থিমের পূজায় চলে প্রতিযোগিতা। পুরস্কারের লোভে গ্রামবাংলার প্রাণের টান এসে দাঁড়িয়েছে শুষ্ক অনুষ্ঠানে। ঢাকের বাদ্য ক্রমশ কমে আসছে, বেড়ে উঠেছে মাইকে হিন্দি গান, ফাংশন, হুল্লোড়। পুরোহিত এসে পূজা করেন— সামান্য ক'জন এগিয়ে আসেন সাহায্য করতে।

সেকালে-একালের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য চোখে পড়ে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। একটি কুমারী পূজা, অন্যটি বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান। শ্রীরামচন্দ্র পূজাকালীন নবমী তিথিতে দেবীকে দর্শন করেন কুমারীরূপে। তিনি তখন তাঁকে পূজা করেন। সেই থেকে নবমীর দিন কুমারী পূজার প্রচলন হয়ে যায়। অবশ্য বিভিন্ন রূপ কল্পনা করে এই পূজা করা হয়।

যেমন এক বছরের কন্যা সন্ধ্যারূপে, দু বছরের কন্যা সরস্বতীরূপে, তিন বছরের কন্যা ত্রিধামমূর্তিতে, চার বছরের কন্যা কালিকারূপে, পাঁচ বছরের কন্যা সুভগারূপে, ছয় বছরের কন্যা উমারূপে, সাত বছরের কন্যা মালিনীরূপে, আট বছরের কন্যা কুব্জিকারূপে, নয় বছরের কন্যা দেবী সন্দর্ভারূপে, দশ বছরের কন্যা অপরাজিতারূপে, এগারো বছরের কন্যা রুদ্রাণীরূপে, বারো বছরের কন্যা ভৈরবীরূপে, তেরো বছরের কন্যা মহালক্ষ্মীরূপে, চোদ্দো বছরের কন্যা পীঠনায়িকারূপে, পনেরো বছরের কন্যা ক্ষেত্রজ্ঞারূপে, ষোলো বছরের কন্যা অম্বিকারূপে পূজিত হয়।

এই নিয়ম চলে আসছিল বহুকাল পর্যন্ত। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এই শাস্ত্রনীতি ভঙ্গ করলেন। ১৮৯৮ সালে কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তিনি এক মুসলমান মাঝির চার বছরের কন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করলেন। জাতপাত ও বর্ণের বৈষম্য ঘুচিয়ে তিনি বললেন সব কুমারীর মধ্যেই দেবীর অধিষ্ঠান রয়েছে। ১৯০১ সালে নয় জন কন্যাকে তিনি কুমারী সাজিয়ে পূজা করেন দেবীর নবরূপের কল্পনা করে। ভাবের ঘোরে তিনি নবরূপে দেবীকে দর্শন করেন এদের মধ্যে।

সবশেষে আসা যাক বিজয়ার কথায়। তখন বিজয়া কীভাবে পালিত হ'ত— আর এখনই বা কীভাবে হয় দেখা যাক।

জয়ন্তী জয়দে লোকে সর্বলোক জয়প্রদে।
কৃপাং কুরুস্ব দেবী ত্বং সংসার বন্ধ মোক্ষণে ॥

আমরা সহস্র সহস্র বছর ধরে বিশ্বাস করে আসছি মা আমাদের বিজয়দাত্রী। মায়ের কৃপা হলেই জয় পাব, জয়ন্তী, জয়দাত্রী-বিজয়া

মায়ের নাম। বিজয়া অর্থাৎ— বি-জ+অচ স্ত্রিয়ামটাপ। জি ধাতুর অর্থ জয়, বি উপসর্গের যোগে বিজয়, মানে বিশেষরূপে জয়। স্ত্রীলিঙ্গে বিজয়া, কারণ বিজয়া একটি তিথি বিশেষ। পুরাকালে রাজারা এই তিথিতে যুদ্ধযাত্রা করতেন। কারণ এদিন যাত্রা করলে নাকি জয় অবধারিত। মহাবল পদ্ম নামে দৈত্যকে পরাজিত করে দেবী হন বিজয়া, সুরগণকে পরাজিত করে তিনি হয়েছিলেন বিজয়া। বিজয়ার অন্য অর্থ হল পীযূষরূপ। সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত অমৃতের আর এক নাম বিজয়া। অমৃত হল মানুষের শুভশক্তি ও শুভবুদ্ধি। বিজয় উৎসব হল তারই প্রতীক। রাম রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে— বিজয় উৎসব পালন করেছিলেন এই দিনে। আবার মায়ের বিসর্জনের তিথিও হল এই বিজয়া দশমী তিথি।

সেকালের বিজয়ার সূচনা হ'ত আনন্দঘন মুহূর্ত আর বেদনার মিশ্রণে। মা এসেছেন চার দিনের জন্য বাপের বাড়ি। বিজয়ার দিন সব অন্ধকার করে তিনি ফিরে যাবেন পতির কাছে। তাই সবার চোখে জল। রাত পোহালেই দশমী। কবি মেনকার কথায় গেয়ে ওঠেন— নবমী নিশি পোহাইও না/

কখনও বা বলেছেন, "এবার আমার উমা এলে আর মাকে পাঠাব না"। একবার রানি রাসমণির জামাই মথুরবাবু বিজয়ার দিনে মায়ের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। তিন দিন পরম আনন্দে কাটাবার পর দশমীর পূজা শেষ করে পুরোহিত খবর দিলেন দর্পণ বিসর্জন হয়েছে। এবার সন্ধ্যাবেলা মায়ের বিসর্জন হবে। মথুরবাবু ঘোরের মধ্যে ছিলেন চমকে উঠলেন। বললেন— "না মায়ের বিসর্জন হবে না। আমি এই আনন্দের হাট ভাঙতে দেব না।" কেউ যখন বুঝিয়ে পারল না— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে মথুরবাবুর বুকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মা কি কখনও সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারেন! এতদিন বাইরের দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, এবার সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে পূজা নেবেন। আসল পূজা তো বাইরে নয়, অন্তরে'।

বড় গামলায় হলুদ জল গোলা রাখা হল, তাতে দর্পণ দিয়ে তার ভেতর দিয়ে বাড়ির সকলে দেখলেন মায়ের চরণ-যুগল। এবার মায়ের যাত্রাকাল উপস্থিত। উপস্থিত আত্মীয়া, বাড়ির বয়স্কা মহিলা এয়োতিরা সকলে এগিয়ে আসতেন মাকে বরণ করে বিদায় জানাতে। তাঁদের হাতে থাকত শাঁখ, বরণডালা, মিষ্টি, জল, কনকাঞ্জলির চালের থালা। মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে দিতেন শাঁখা, পলা, লোহা। পাঁচ, সাত, নয়— বিজোড় সংখ্যায় এয়োরা বরণ করতেন উলু দিয়ে। এয়োরা সাজতেন কনের সাজে।

গরদের লালপাড় শাড়ি, নাকে নথ, কানে ঝুমকো, গলায় চন্দ্রহার— অল্পবয়সিদের সিঁথিতে টিকলি, সবাই যেন মা দুর্গার এক-একটি রূপ। জমিদার বাড়ির ব্যাপার, পায়ে থাকত রুপোর মল, আর হাত ভরতি চুড়ি, বালা, কঙ্কণ— এমনকী উপর হাতে থাকত তাগা। অবশ্যই সোনায় মোড়া প্রতিমার মতো। মায়ের সিঁথিতে ও পায়ে সিঁদুর দিয়ে বরণ শেষ হ'ত— ঢাক, কাঁসর, শাঁখ আর উলুধ্বনির মাধ্যমে। এবার বাড়ির কর্ত্রী মাকে মিষ্টি খাওয়াবেন, জল খাওয়াবেন, শেষে পানের খিলি হাতে গুঁজে দেবেন। বিদায়ক্ষণটা হয়ে উঠত স্বর্গীয়। ঢাকি ঢাকে বোল তুলত— 'মা থাকবে কতক্ষণ, মা যাবে বিসর্জন'।

এরপর শুরু হ'ত সিঁদুর খেলা। হোলির মতো ছোটখাট একটা অনুষ্ঠান। মায়ের বিদায় ব্যথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে সবাই মেতে উঠত আনন্দে। কুলি ভাড়া করা হ'ত। দুটো বাঁশের ওপর মার মূর্তি তোলা হ'ত। আগাগোড়া কাঁধে চড়ে যেতেন মা। শোভাযাত্রা হ'ত দেখার মতো। বিলিতি ব্যান্ড, তাসা, সানাই, কী না থাকত। পিছন পিছন যেতেন প্রজারা, আত্মীয়রা— বাড়ির যুবা পুরুষ। মেয়েদের কোনও স্থান ছিল না। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বাড়ির ছেলেরা যেতেন। কর্তার হাতে থাকত মঙ্গলঘট।

অনেকসময় তা বহন করতেন পুরোহিত। ধুনুচি নৃত্য চলত, চলত দামি দামি আতসবাজি পোড়ানো। মায়ের দুপাশে বড় বড় চামর দিয়ে হাওয়া করত বাড়ির কাজের লোকেরা। চতুর্দিকে জ্বলত হ্যাজাক আর গ্যাসের আলো। পথটা হয়ে উঠত দিন। মায়ের বিসর্জন হলে মঙ্গলঘটে জল পূর্ণ করে সবাই ফিরে আসতেন বাড়িতে। মঙ্গলঘট রাখা হ'ত বেদিতে বড় পিলসুজে জ্বলত প্রদীপ, শান্তির জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ত। ছোট ছোট কলাপাতায় লাল কালিতে ডুবিয়ে খাগের কলম দিয়ে লেখা হ'ত শ্রীদুর্গা নাম। সকাল থেকেই বাড়িতে ভিয়েন বসত। গামলা গামলা রসের মিষ্টি, সন্দেশ, নারকেল নাড়ু, বড় বড় নিমকি তৈরি হ'ত। আর একটি বিশাল পাত্রে বড় বড় গ্লাসে তৈরি করে রাখা হ'ত সিদ্ধি। যেখানে যতজন থাকতেন পেটপুরে তাঁরা খেতেন মিষ্টি নোনতা আর সিদ্ধি। প্রজারা আসত দেখা করতে, সকলকে দেওয়া হ'ত মিষ্টির সঙ্গে টাকা। জমিদার বাড়ি ছাড়াও এই প্রথাটা কম-বেশি বড় বড় আমলাদের ঘরেও হ'ত। অবশ্যই খাবার আগে প্রণামের পালা চলত, চলত কোলাকুলি— পূর্বপুরুষদের ছবিতে প্রণাম।

*(পরবর্তী অংশ ১২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# ছিয়াশিতেও যেন তরতাজা যুবক আজও সমান কর্মোদ্যোগী মণি ভৌমিক

নিমাই দে

তমলুকের প্রত্যন্ত গ্রামের মাটির বাড়ি থেকে বেভারলি হিলসের রাজপ্রাসাদ। ছেঁড়া কাঁথা থেকে টাকার পাহাড়ে। এককথায় rags to riches। উত্তরণটা অবশ্য মোটেও সহজ ছিল না।

দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে পায়ে যখন স্কুলে যাওয়ার জুতো জোটেনি প্রায় ১৬ বছর পর্যন্ত, তখন তা তো ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখারই শামিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি স্বপ্নও দেখেছিলেন। আবার তাকে বাস্তবেও পরিণত করেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে দামি রোলস রয়েস গাড়িতে পাশ্চাত্য কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সঙ্গে অবশ্যই ছিল অক্লান্ত পরিশ্রম, জেদ। মণি ভৌমিকের কথায়, আমার মধ্যে জন্ম নিল একটি ভাবনা— আমি আমার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তি পাব দারিদ্র্য থেকে। আমি আমার জ্ঞানকে রূপান্তরিত করব সোনায়।

সত্যিই এরপর থেকে তিনি জ্ঞান সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়েছেন। তিনি নিজেই বলছেন, জলে যেমন হাঁস, তেমনি অঙ্কে ও বিজ্ঞানে আমি। গণিতের সুষম সৌষ্ঠব এবং বিজ্ঞানের অম্লান যুক্তি আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল। এবং সেই সময় থেকেই আমি যেন প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে জানতে পারলাম যে অঙ্ক আর বিজ্ঞানই একদিন আমাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ দেখাবে। আমি পৌঁছতে পারব স্বপ্নের শিখরে।

পরীক্ষায় ১৫টি প্রশ্নের মধ্যে ১০টির উত্তর দিলেই ফুল মার্কস। তবু তিনি ১৫টিরই উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তার জন্য ১০০-র বদলে তাঁকে কেন টিচার ৯৭ দিয়েছিলেন, তার উত্তর এখনও তিনি পাননি।

ফেলোশিপের সুবাদে পকেটে মাত্র তিন ডলার নিয়ে বিদেশে পা। তাও সেই অর্থ জোগাড় করে দিয়েছিলেন গ্রামবাসীরাই। তারপর সহকর্মীর সঙ্গে যুগান্তকারী লেসারের আবিষ্কার। যা চোখের অপারেশনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এমন অনুসরণ এবং অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ডঃ মণি ভৌমিক একই সঙ্গে পদার্থবিদ, লেখক, গবেষক, আবিষ্কারক...! যে জায়গাতেই হাত রেখেছেন, তা তাঁর জীবনে সোনা ফলিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই তিনি যেন মণিকাঞ্চন!

মেদিনীপুরের ছোট্ট একটি গ্রামে জন্ম ১৯৩১ সালে। কৃষ্ণগঞ্জ কৃষি শিল্প বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাবার প্রত্যহ যোগাযোগের সুবাদে মহিষাদলের কোনও একটি ক্যাম্পে গান্ধীজির কাছাকাছি আসার সুযোগ। তাঁর একটা কথা এখনও মনে রেখেছেন তিনি। তা হল, হ্যাপিনেস ইজ ইনসাইড জব। এরপর শহরে পা। ভরতি হলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। কিন্তু দরিদ্রতা প্রতি পদে তাঁকে চরম সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। শুধু টিউশন ফি মকুব করার জন্যই বাইবেল ক্লাসে হাজিরা দিতে হয়েছে তাঁকে। পরীক্ষায় ১৫টি প্রশ্নের মধ্যে ১০টির উত্তর দিলেই ফুল মার্কস। তবু তিনি ১৫টিরই উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তার জন্য ১০০-র বদলে তাঁকে কেন টিচার ৯৭ দিয়েছিলেন, তার উত্তর এখনও তিনি পাননি। মনে পড়ে স্কটিশ চার্চ কর্তৃপক্ষকে অবাক করে দিয়ে তিনি পুরস্কার স্বরূপ পাওয়া টাকায় বাইবেল নয়, কিনেছিলেন বিবেকানন্দ পত্রাবলি।

এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রি করার সময়ই যাঁর সুনজরে পড়লেন, তিনি হলেন সত্যেন বোস। জীবনে যেমন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন, তেমনি ফলও পেয়েছেন হাতেনাতে। ১৯৫৮ সালে খড়গপুর আইআইটি থেকে প্রথম ছাত্র হিসেবে কোয়ান্টাম ফিজিক্সে পিএইচডি পান। এরপর তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল একটি মাত্র ফেলোশিপ। যার সুবাদেই অচেনা বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে নতুন সংগ্রামের সূচনা, নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু।

তবে প্রতিভা আর আত্মবিশ্বাস একজোট হলে মানুষ যে কত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে, তারও এক জ্বলন্ত উদাহরণ মণি ভৌমিক। তিনি এও বিশ্বাস করতেন, *হার্ডশিপ টাফেনস অ্যান্ড হার্ডেনস এ ম্যান।*

তাই তিনি অতীতকে ভুলে যাননি। বিস্মৃত হননি এই আপ্তবাক্য থেকে যে দিনের শেষে আপনার হাতে প্রচুর টাকা থাকতে পারে। তা কিন্তু শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তাই ফিরে গিয়েছেন সেই জগতে যেখানে একসময় তাঁরই মতো চরম অর্থাভাবে মেধাবী ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। এদেরই সাহায্যার্থে তৈরি করেছেন ভৌমিক এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন। বছরে ৫০ থেকে ৭০ হাজার ডলার খরচ করেন সেই মহতী লক্ষ্যে— শিক্ষার ক্ষেত্রে দরিদ্রতা যেন গ্রামের একটি সহজ সরল ছেলের পথে কাঁটা হয়ে না দাঁড়ায়। ভুলে যাননি খড়গপুর আইআইটিকে, যে প্রতিষ্ঠানের প্রথম পিএইচডি ডিগ্রিধারী তিনিই। গবেষণার জগৎকে আরও বিস্তৃত এবং উন্নত করতে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে ১৫ একর জায়গাজুড়ে এক বিরাট প্রকল্পে হাত দিয়েছেন— ভৌমিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ। যদিও নানা আইনি জটিলতায় সেই কাজ মাঝপথে থমকে রয়েছে। আর এটাই কিছুটা হলেও তাঁকে ব্যথিত করেছে। নিজেই তাই বলে ফেললেন, আমার জীবদ্দশায় আর এটা দেখে যেতে পারব কি জানি না।

মণি ভৌমিকের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার এক যোগসূত্র তৈরি করা। ১৯৭২ সালে আমেরিকার অপটিক্যাল সোসাইটির এক সম্মেলনে তিনি তাঁর এই যুগান্তকারী এক্সিমার লেজার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করেছে। চশমা ছাড়াই তাঁরা এখন জীবন অতিবাহিত করার এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। ড. ভৌমিক এখন মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ফেরানোর কাজে ব্রতী। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান একটাই।

তাঁর উপলব্ধি হল, বিজ্ঞানের চোখের উপর ধর্ম কোনও পরদা টেনে দেয়নি। ধর্মের অন্দরে পড়েছে বিজ্ঞানের আলো। বিজ্ঞানের যুক্তির উপর ভর করে এখন আমরা জানতে পারছি যে মূল উৎস থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন কিছু নই। আমাদের অস্তিত্বের অণু-পরমাণুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আদি উৎস। তাই ডঃ ভৌমিক রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলছেন, তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ/ও তার অন্ত নাই গো নাই।

পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে তার সার্থক নামকরণ কোয়ান্টাম মেডিটেশন। বিজ্ঞান বলছে, সৃষ্টির আদি উৎসের সঙ্গে ধ্যানের গভীরতর স্তর যুক্ত হওয়ার পর মনে হবে সবক'টি ইন্দ্রিয় যেন একটি ইন্দ্রিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। অনুভবের বিচিত্র উৎস তখন পরিণত হবে একটি উৎসে। সমস্ত সৃষ্টির মূলে যে ক্ষমতা, আমরা পৌঁছে যাই তার কাছে। এই ক্ষমতাই একক এবং আদি উৎসের ক্ষমতা, যা ডঃ ভৌমিকের কথায় ব্রহ্ম।

পড়াশুনা, গবেষণা, পড়ানো, বই লেখা প্রভৃতি ব্যস্ততার মধ্যে পার করে দিয়েছেন জীবনের ৮৬টি বছর। আগামী ৪ জানুয়ারি তাঁর ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেটার প্রস্তুতির জন্যই কয়েকদিন আগেই কলকাতায় এসেছেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ফিজিক্সে নোবেল বিজয়ী ডেভিড গ্রস। আজ, শুক্রবার তাঁকে সংবর্ধনা দিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

তারই আগে দেখা হয়েছিল আলিপুরের তাজ বেঙ্গল হোটেলে। প্রথম আলাপের ঠিক আগের মুহূর্তে যেভাবে খট খট করে জুতোয় আওয়াজ তুলে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন, তাতে মনে হল এখনও তিনি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের ঈর্ষার কারণ হতে পারেন। এখনও তিনি অনুকরণীয়। ❑

বর্তমান পত্রিকা থেকে সংকলিত।

---

*(ভুতুড়ে কণার কীর্তি আবিষ্কার... নতুন আশা– ১২৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)*

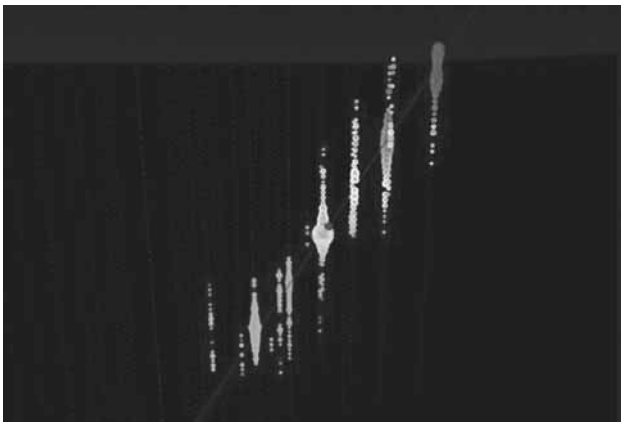

ভুতুড়ে কণাদের বিচিত্র কেরামতি চাক্ষুষ করতে কেন লাগল সাড়ে ৪ দশক?

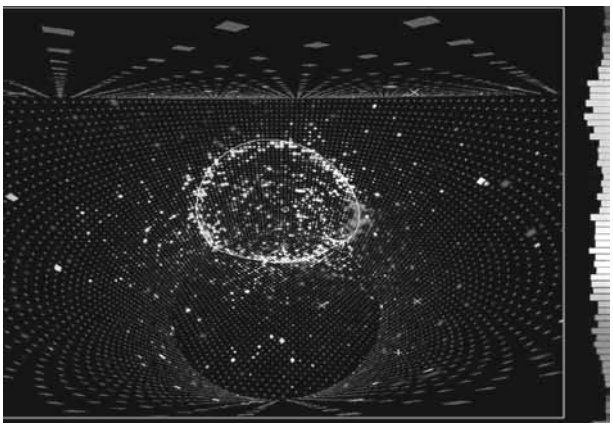

প্রথম যখন জানা গেল খুব সামান্য হলেও ভর রয়েছে ভুতুড়ে কণাদের। ১৯৯৮-এ

অনুসন্ধানের কাজটা সহজ হবে। দুই, তারাদের মৃত্যুর পর যে বিস্ফোরণ হয়, সেই সুপারনোভা থেকে বেরিয়ে আসা নিউট্রিনোদের খোঁজ পাওয়ার ক্ষেত্রেও এ বার কিছুটা সুবিধা হতে পারে। তিন, পৃথিবীর কোথায় কোথায় অস্ত্র বানানোর লক্ষ্যে পরমাণু চুল্লি বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর গোপনে বানানো হচ্ছে বা চালু রয়েছে, তার হালহদিশ জানার উপায় বাতলে দিতে পারে এই আবিষ্কার। যে প্রযুক্তিতে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, তা অভিনব। প্রযুক্তির অভাবে ভারতে মূলত বায়ুমণ্ডলের হাই এনার্জির নিউট্রিনোদের নিয়েই গবেষণা হয়েছে এত দিন। এখনও হচ্ছে। লো এনার্জি নিউট্রিনোদের নিয়ে এ ধরনের গবেষণা এ দেশে এখনও পর্যন্ত হয়নি। হালকা, পাতলা ভুতুড়ে কণারা যে সৃষ্টির আদি কাল থেকেই খেলে যাচ্ছে হাতি নাড়ানোর 'মাদারিকা খেল' এই সে দিন আমরা তা দেখতে পেলাম!

প্রায় ১৪০০ কোটি বছর ধরেই আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে চলছিল এই ভুতুড়ে কণারা। ❑

# সৌভাগ্যমদগর্ব এবং মানভঞ্জন করে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রেমে লীলাময়

চিদানন্দ গোস্বামী

তথ্য আর তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। তথ্য পল্লবিত, তত্ত্ব মূলানুগত। বলেছেন, শ্রীমান মহানামব্রতজি। তথ্য বাইরের বিচার করে। তত্ত্ব গভীর উপলব্ধি ঘটায়। রাসের মধ্যভাগে সহসা যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেটা তথ্য। আর তার অন্দরমহলে রয়েছে কৃষ্ণপ্রেমের গোপী প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব। বস্ত্রহরণের দিনই শ্রীকৃষ্ণ কথা দিয়েছিলেন গোপীদের। 'আগামী শারদ পূর্ণিমার রজনীতে মিলিত হইব তোমারদের সঙ্গে'। সেই রাসেই রসনেচ্ছা বা রিরংসা জাগল কৃষ্ণের। রাসৌলির পরিবেশ মধুময়। শারদ পূর্ণিমার রাত। পূর্ণচন্দ্র, কুসুমিত বন, ভ্রমরের গুঞ্জন। গোপীদের সমগ্র সত্তায় কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার। আর 'বংশী তো বড় উদ্ধত'। বড় সুন্দর প্রকাশ মহানামব্রতজির প্রতিভার ও ধ্যানময়তার। জাদুকরি বাঁশির আমন্ত্রণে সমাগত গোপিনীরা। কৃষ্ণ ডেকে বলছেন 'জগৌ কলং বামদৃশাং'।

নিবন্ধের সূচনায় বলতেই হয়, এ যুগে রাসের বর্ণনা মনোবিশ্লেষণ। প্রেমের গভীরতা মহাপ্রাজ্ঞ মহারসিক ও মহাসাধক মহানামব্রতজির সৃষ্টি কাব্যগুণ ও দার্শনিকতায় অদ্বিতীয় অসাধারণ ও অভিনব। সেই আলোতেই পথ দেখে এই নিবন্ধের বিনীত প্রয়াস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ জাহ্নবী চক্রবর্তী ও ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাসে পড়াতে পড়াতেই মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আমার বলতে ইচ্ছা হয় সেই ব্যাখ্যা কোনও কোনও ভাগ্যবানে পড়িবারে পায়।

> 'দুই কটাহে দুগ্ধ। একই স্থান হইতে অগ্নিযোগ দেওয়া হইতেছে। ফল হইল দুই প্রকার। এক কটাহ হইতে দুগ্ধ উপচাইয়া পড়িয়া গেল। ইহা যেন মদযুক্ত গোপী। আর এক কটাহের দুগ্ধ ঘন হইতে হইতে অতিঘন হইয়া কটাহে লাগিয়া যাইবার মতো হইল। ইহা মানিনী গোপীর মতো মানিনী যেন দুগ্ধের ক্ষীর।

হ্যাঁ গোপীরা উপস্থিত। এবার কোথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ছলা-কলায় ওদের হৃদয় প্লাবিত করবেন, তা নয়। অভিযোগ আর উপেক্ষা। গভীর রাত নির্জনতা পতি ত্যাগ করে পরপুরুষের কাছে ছুটে আসা ইত্যাদি অভিযোগে পোপীদের কাঠগড়ায় তুললেন। উপপত্যদোষ তার মধ্যে প্রধান অভিযোগ। প্রেম করে প্রেমিকাকে ডেকে এনে অবমাননার এ কী কাণ্ড! গোপীরা সহ্যও করে যাচ্ছে। খণ্ডনও করছে। হতাশায় আচ্ছন্ন গোপীরা। ক্রন্দন সম্বল ওদের। বলছে, আমরা ফিরব না তোমাকে ছেড়ে। কৃষ্ণ-গোপীর বাকযুদ্ধে অনমনীয়া গোপীরা এক সময় বলছে, ফিরায়ে দিও না প্রভু। অনেক বিতর্কের পর প্রীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শুরু করলেন রাসক্রীড়া। শত কোটি গোপী পরিবৃত কৃষ্ণ। সবাই দেখেছেন নিজেকে কৃষ্ণ সন্নিধানে সংলগ্ন। রাধারানি সবার সঙ্গে এই সংলগ্নতাটি নজর করছে। আর অন্তরলোকে কী যেন একটা অভিযোগ দানাও বাঁধছে।

ঠিক এমন সময়ই মুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটে গেল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যা রাসলীলার মোড় ঘুরিয়ে দিল। বাস্তব হলেও মানস্তাত্ত্বিক ও দুর্জ্ঞেয় অন্তরতাত্ত্বিক। খুব ভালোভাবেই বুঝে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণ। মধুময়লীলায় এক আপাতদুর্বিপাক। ছায়ামেদুর হয়ে গেল প্রেমের মিলনমেলা। কী সেটা?

সকল গোষ্ঠীর শিরোমণি যিনি, গোপীকুলের যিনি চূড়ামণি, সেই রাধারানির হল মান। কেন? কৃষ্ণ সকল গোপীদের সঙ্গে সমভাবে লীলা করছেন। এ তো অসহ্য। তীব্র ক্ষোভ রাধার। যিনি গোপীদের শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ব্যবহারই তো তাঁর প্রাপ্য। কেন সবার মতো করে আমি কৃষ্ণকে পাব? কেন আরও বিশেষ করে বেশি করে পাব না? মহানামব্রতজির গভীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। হ্যাঁ, মানিনী হলেন রাধারানি।— 'সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।/রাধার কুটিল প্রেম হৈল বামতা ॥ (চৈঃ চঃ)

মানিনীর হৃদয়পাত্র আদৌ ভরে ওঠেনি। আরও চাই। এটাই রাধার প্রতিক্রিয়া। আরেকটি দিক চন্দ্রাবলী ও বিপক্ষীয়া যূথের গোপীদের। তাদের হল সৌভাগ্যমদগর্ব। সৌভাগ্যমদান্বিতা। ওদের অহমিকা, আমরা কৃষ্ণপ্রেম সমানভাবেই পেয়েছি। এই সৌভাগ্য নিয়েই ওদের গর্ব। জন্ম হল 'মদ'-এর। এবং রাধার মান। রাধার মান কৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণা বর্ধন করে। কেননা ওটা গভীর প্রেম থেকেই উৎপন্ন। আর গোপীদের মদের জন্ম ঈর্ষা থেকে।

এই মানের কারণেই রাধা রাসৌলি ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন বড় দুঃখে, অভিমানে। কিন্তু রাধাবিহনে রাসে কৃষ্ণ থাকেন কী করে! রসময়ী ছাড়া রসময় থাকেন কী করে! কৃষ্ণও প্রস্থান করলেন রাধা সন্ধানে। তাহলে কৃষ্ণের নিষ্ক্রমণের মূল উদ্দেশ্যটি দ্বিবিধ। রাধার মান প্রসাদন এবং গোপীদের সৌভাগ্যগর্ব প্রশমন। কিন্তু আপাত অর্থে এই ঘটনাটি রাসলীলার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে মনে করলেও অন্তরঙ্গ স্তরে রয়েছে মূল্যবান দিকটি। প্রেমের যথার্থ স্বরূপ, প্রেমের মাহাত্ম্য এবং প্রেমের যথার্থ প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য। এ দুটো ঘটনাই গভীর তাৎপর্যের।

গোপিনীরাও রাসকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল কৃষ্ণ সন্ধান করতে। উল্লিখিত দুটি প্রতিক্রিয়ার মানসিকতা প্রসঙ্গে মহানামব্রতজি আশ্চর্য যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাগবতের ফেলালবে, তা সুগভীর আস্বাদনের বিষয়। মধু মধু। 'দুই কটাহে দুগ্ধ। একই স্থান হইতে অগ্নিযোগ দেওয়া হইতেছে। ফল হইল দুই প্রকার। এক কটাহ হইতে দুগ্ধ উপচাইয়া পড়িয়া গেল। ইহা যেন মদযুক্ত গোপী। আর এক কটাহের দুগ্ধ ঘন হইতে হইতে অতিঘন হইয়া কটাহে লাগিয়া যাইবার মতো হইল। ইহা মানিনী গোপীর মতো মানিনী যেন দুগ্ধের ক্ষীর। এখন মদের করিতে হইবে প্রশমন। উপচাইয়া পড়া দুগ্ধের উপচানো বন্ধ করিতে হইবে। আর মানের করিতে হইবে প্রসাদন। ঘন ক্ষীর তুলিয়া ভোগ লাগাইতে হইবে। অগ্নির তাপ কমাইয়া দিলে একেবারে দুই কার্য হইতে পারে।... আদর কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।' (ভাঃ ১০) গোপীরা আগেই দেখেছিল, তাদের পাশে কৃষ্ণ নাই। ওরা স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছে, ওদের কৃষ্ণ সন্নিধান নিয়ে সৌভাগ্য বিষয়ে জন্মে যাওয়া গর্বই বোধ হয় কৃষ্ণের অনুপস্থিতির কারণ। ওদের ঈর্ষার কেন্দ্র রাধার সঙ্গে যেমন, তেমনি আমাদের সঙ্গেও লীলা করেছেন কৃষ্ণ। এই অতি আত্মতৃপ্তি বোধটিই গর্বের কারণ হয়েছে ওদের। সৃষ্টি হয়ে গেছে 'মদ'-এর। এবার কৃষ্ণ কুঞ্জ ছেড়ে চলে যাওয়াতেই মদ প্রশমিত হয়ে গেল। ভাবল, কৃষ্ণ অন্তর্ধান করেছেন রাধার সন্ধানেই নিশ্চয়। রাধার শীর্ষস্থানীয় মর্যাদা বুঝল ওরা।

এখন 'মদ'-এর প্রশমনের পর কৃষ্ণের মৌল উদ্দেশ্য হল মানিনীর মান প্রসাদন বা মান ভঞ্জন। নির্জন বনে একান্তে তাঁর মন প্রসাদন করতে হবে। তবেই রাসের মধ্যভাগে এই ছেদ নিয়ে যে সমস্যা হল, তার সমাধান হয়ে যাবে। অবশ্য দেবী যোগমায়াই তো এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। কেন? অবশ্যই বিরহ সৃষ্টির জন্য। অনুশোচনার পথ ধরে গোপীদের হোক বিরহ। বিরহ ছাড়া তো মিলন সম্পূর্ণ হয় না। তখনই তো হবে অনন্ত প্রেম পুরুষ কৃষ্ণের পূর্ণ আস্বাদন। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর তাই তো বলেছেন, 'প্রভু প্রভু প্রভু হে অনন্তানন্তময়'। গোপীরা বনে বনে যত্রতত্র কৃষ্ণ সন্ধান করছে। বৃক্ষলতা পুষ্পহরিণী ভ্রমর সবার কাছে কাতর জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণকে দেখেছ? পথের ধুলোকেও— কোথায় কৃষ্ণ, বল। কবি নজরুল গোপীমানস নিয়ে বলেছেন, 'আমি ধূলি হব।/ শ্যাম যে পথ দিয়ে চলে গেছে/ আমি সেই পথেরই ধূলি হব'।

সহসা ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ সমন্বিত চরণচিহ্ন দেখতে পেল গোপিনীরা। শুধু তাই নয়, সেই চিহ্নের পাশে আরেকটি চরণচিহ্নও। ওদের অভ্রান্ত প্রত্যয়, সেটি নিশ্চয়ই রাধার। কৃষ্ণ ক্লান্ত রাধাকে স্কন্ধে নিয়ে পথ চলেছেন নিশ্চয়ই। ভূয়সী প্রশংসা না করে পারেনি ওরা ওই বিশষ চরণচিহ্নের অধিকারিণী গোপীর পরম সৌভাগ্যের।— অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।/যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো থামনয়দ্রহঃ ॥ (ভাগবত ১০/৩০/২৮)

ওদিকে রাধিকা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ পাশেই। অথচ রাধার বিরহ দশায় মনে হল তিনি কৃষ্ণহারা। হাহাকার করে ডাকছেন কৃষ্ণকে। হে নাথ দেখা দাও ইত্যাদি। এটি রসের দিক থেকেই প্রেমবৈচিত্র্য। কাছে পেয়েও প্রেমিককে কাছে নেই মনে করা। বৈষ্ণব পদকর্তা বলছেন, 'কুঞ্জে শুতলি ভূজ পাশে,/ কানু কানু করি রোয়ত সুন্দরী/ দারুণ বিরহ হুতাশে'।

কৃষ্ণ আবার অন্তর্ধান করলেন। কিন্তু বৃক্ষের আড়াল থেকে সব দেখছেন। অন্যান্য গোপীরা এসে রাইয়ের শুশ্রূষা করছে। আর বিরহ দশা দেখছে। অভিভূত হয়ে দেখছে, বিরহ কারে কয়, প্রেম কারে কয়। রাধিকা যে প্রেমে শীর্ষবিন্দুতে সেটা না ভেবে পারছে না। ওই বিরহ থেকেই সৃষ্টি হল বিপ্রলম্ভ রস। ঘন মাধুর্যময়। সুস্থ হলেন রাই। এলেন কৃষ্ণ। মান দূর হল।

রাসের অনুকূল পরিমণ্ডল। গোপীরা জিজ্ঞেস করল, আবার কেন অন্তর্ধান হয়েছিলে নাগর? কৃষ্ণের উত্তর, বিরহ আস্বাদনের জন্য। বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনের জন্য। আর একটি কথা, যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করেও আমি গোপীদের ঋণ রাইঋণ শোধ করতে পারিনি। আর পারবও না কোনও কালে। চিরঋণী হয়েই থাকব।

রাসক্রীড়া শুরু হল। আনন্দে প্রেমে নৃত্যগীতে ছন্দে বিভোর রাসমণ্ডল। ❑

## অমৃত বাণী

# অমৃতকথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

প্রশ্ন : জপ করে অনেক সময় মনে হয় কোন ফল হ'ল না, কেন মহারাজ?

উত্তর : হ্যাঁ, মনে সন্দেহও আসে; করলুম বটে, কিন্তু হ'লটা কি? যাই হোক, তুমি তোমার কাজ করে যাও।

প্রশ্ন : চলতে ফিরতে জপ করা যাবে? ধ্যান করার সময় একই মন্ত্র ভাবব?

উত্তর : হ্যাঁ যাবে, মনে মনে করবে। হ্যাঁ ভাববে।

প্রশ্ন : মহারাজ, এমনি 'নাম' করা আর বীজমন্ত্র জপের মধ্যে তফাত কি?

উত্তর : কিছু তফাত হয়। মন্ত্রের একটা সার্থকতা আছে, এতে মনটা Steady হয়; মনকে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তিতে ধরে থাকা। পরম্পরার একটা দাম আছে। বীজ মানে ঠাকুরের নাম, বীজ হল সংক্ষিপ্ত রূপ, মন্ত্রের যে সংক্ষিপ্ত রূপ তাকে বলে বীজমন্ত্র। জপের দ্বারা মনের শক্তি বাড়ান যায়, মনোধর্ম নিজের আয়ত্তে আসে। তা না হলে জগন্নাথে গিয়ে কেউ পুঁইমাচা দেখে— কারণ তার মনোধর্ম আরোপিত হয় বলে।

সমুদ্র চারিদিকে জল, মাঝখানে একটি মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অগাধ জল, কোন কূল-কিনারা নেই! সর্বব্যাপীকে ধারণা করা যায় না বলে আমরা একটা উপমা দিই। আকাশকেও ধারণা করা যায় না, একটা পাখি শুধু আকাশে উড়ছে। সীমাহীন আকাশ, তার শেষ নেই, সেখানে শুধু একটি পাখি!

প্রশ্ন : জপটা আপনার কাছে পৌঁছলেই হবে, মহারাজ?

উত্তর : 'আমি' মানে গুরু, সেই গুরুর কাছে পৌঁছুতে হবে। এই দেহ, যা একদিন ভস্মীভূত হয়ে যাবে, সেই দেহের কাছে নয়।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন গুরু ইষ্ট, ইষ্ট গুরু।

উত্তর : তা যখন বলা হয়, গুরুর মধ্যে ইষ্টকে চিন্তা করতে বলেছেন। সেই ইষ্টকে কি কেউ পুড়িয়ে দেবে?

প্রশ্ন : রাজা মহারাজা বলেছেন, আধ্যাত্মিক জগতে কেউ বিফল হয় না!

উত্তর : সে তো বটেই।

প্রশ্ন : বারংবার জপ করতে করতে তা mechanical মনে হয় কেন?

উত্তর : এই জন্য বলছেন যে জপের সঙ্গে ধ্যান করতে হবে।

প্রশ্ন : ধ্যান জানি না, theoretically জানি, কিন্তু practically জানি না।

উত্তর : জান, কিন্তু বল, আমরা করতে পারি না। ধ্যান মানে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা। ধ্যান যাতে হয় তার চেষ্টা কর, চেষ্টা করতে করতে দৃঢ়তা আসবে। একজন বলেছিল— 'Failure is the pillar of success'. তারপর কয়েকজন ছাত্র একটা দল করে তার নাম দিয়েছে 'Pillar Society', তাদের বক্তব্য হল— আমরা বছর বছর ফেল করি তাই 'Pillar Society'। খুব গভীর ধ্যান হয় যখন, তখন আর জপ হয় না। জপ হয় ক্ষণে ক্ষণে নাম করা অর্থাৎ ধ্যানে পৌঁছে দেবার উপায় হল জপ। জপ হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু যখন তা Continuous হয়, বিচ্ছিন্ন হয় না, তখন তা হল ধ্যান। তোমার এই কথাটা খুব সত্য যে, আমরা theoretically জানি, কিন্তু practically জানি না।

প্রশ্ন : ধ্যানের কোনো specification আছে?

উত্তর : কোন কথা নেই, যেমন সুবিধে।

প্রশ্ন : কোন form ছাড়া ধ্যান হয় কি?

উত্তর : তা হয়। ঠাকুর একটা উপমা দিয়েছেন— সমুদ্র চারিদিকে জল, মাঝখানে একটি মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অগাধ জল, কোন কূল-কিনারা নেই! সর্বব্যাপীকে ধারণা করা যায় না বলে আমরা একটা উপমা দিই। আকাশকেও ধারণা করা যায় না, একটা পাখি শুধু আকাশে উড়ছে। সীমাহীন আকাশ, তার শেষ নেই, সেখানে শুধু একটি পাখি!

প্রশ্ন : ধ্যান কী মহারাজ? তখন জপ না হলেও হয়?

উত্তর : ধ্যান মানে চিন্তা। কোন দেবতার চিন্তা, তাঁর রূপ-গুণের চিন্তা; জগতের তত্ত্বের চিন্তা; তোমার নিজের চিন্তা। হ্যাঁ, তা না হলেও ভাল।

প্রশ্ন : জপের সঙ্গে ধ্যান থাকবে তো?

উত্তর : থাকা ভাল!

প্রশ্ন : জপের ফল সমর্পণ করার কৌশলটা কী?

উত্তর : চেষ্টা করা। স্বার্থ বুদ্ধিতে করবে না, এই হল কথা।

প্রশ্ন : জপধ্যানে মন বসতে চায় না যে, রাতে খাবার পরে উপধ্যান করা যায়?

উত্তর : জপধ্যানে মন বসবে কী করে? সর্বদা তোমার মন তো অন্যদিকে আছে। মন সবার চঞ্চল, তাই জপ-ধ্যানে কি আর মন বসে? মনকে অন্যদিক থেকে সরিয়ে আনতে হবে। শুদ্ধ মন ছাড়া বিবেক হয় না। তুমি কি তোমার শুদ্ধ মনকে জান? তোমার মনকে কি বাসনাশূন্য করতে পেরেছ? ধীরে ধীরে সব হবে। ❑

'অমৃতের উৎস সন্ধানে' থেকে সংকলিত।

# আকাঙ্ক্ষা

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥" ৪/১১

কৃষ্ণ বলেছেন, পরমপুরুষকে যে মানুষ যেভাবে চায় অর্থাৎ পরম পুরুষের কাছ থেকে যে মানুষের যে ধরনের আকাঙ্ক্ষা সে সেই রকম জিনিসই পায়। কারুর ইচ্ছে— খুব খাবো, পরমপুরুষ তার ইচ্ছে পূর্ণ করবেন। সে হয়তো পরজন্মে নেকড়ে বাঘ কিংবা শুয়োর হয়ে জন্মাবে। কেবল খাচ্ছে— কেবলই খাচ্ছে। কারুর হয়তো ইচ্ছে— খুব গয়না পরব, পরের জন্মে সে হয়তো ময়ূর হয়ে জন্মাবে। শরীরে নানান ধরনের ছাপ— তারপর কেউ হয়তো দুই দিন পরে তীর ছুড়ে তাকে মেরে ফেলবে। যেমনটি চাওয়া তেমনটি পাওয়া— পরমপুরুষকে যে যেভাবে চায় সে সেইভাবে পায়। সুতরাং এই চাইবার আগে বেশ একটু সতর্ক হয়ে চাইতে হবে। কেউ হয়তো রাজা হতে চাইল। ঠিক আছে, পরের জন্মে সে হয়তো গরীবের ঘরে জন্মাল কিন্তু নামটা হ'ল 'রাজা'। রাজা হতে চেয়েছিল রাজা হয়েছে। তাই চাইতে হয় সতর্কভাবে। এ বিষয়ে বেশ মজার গল্প আছে।

কোন একজন একবার শিবের কাছে বর চেয়েছিল— অমর হব। শিব বললেন, "দেখ, অমর হওয়া তো যায় না। তাই বুঝে-সুজে বর চাও।" সে বলল— "ঠিক আছে, আমি দিনেও মরব না, রাতেও মরব না", তাই সে মরল সন্ধেবেলায়। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে— কিছু না চাওয়া। কৃষ্ণ বলেছেন, 'যে যেমনভাবে চাইবে আমি ঠিক তেমনিভাবেই তার মনোমত ইচ্ছা পূরণ করব।" মানুষ তার ভক্তির স্তর অনুযায়ী তার চাওয়াটা নির্ধারণ করে, কারণ ভক্তি যদি খুব বেশি স্বার্থপ্রণোদিত হয়, তাহলে সে কী চাইবে?— না, অমুক লোকটা আমাকে বড্ড জ্বালাতন করছে, অমুক ভাড়াটেটা কিছুতেই উঠতে চাইছে না, অমুক আমার শত্রু— অতএব, হে ভগবান, হে নারায়ণ, ওকে শেষ করে দাও, নিপাত করে দাও। এখন কেউ যদি বলে— হে ভগবান, লোকটা আমার শত্রু, তুমি তাকে শেষ করে দাও, নারায়ণকেও তো বুঝে-সুঝে কাজ করতে হবে, কারণ শত্রুও তো বলবে— হে নারায়ণ, আমার শত্রুটাকে শেষ করে দাও। তাই নারায়ণের পক্ষে মুশকিল হ'ল— কোন কুল তিনি রাখবেন, কার মনোরঞ্জন করবেন তিনি। তাঁকে সামলে চলতে হচ্ছে সকল দিক। সুতরাং কেউ যদি পরমপুরুষকে বলে আমার শত্রু নিপাত করে দাও, আমার পথের কাঁটাটি সরিয়ে দাও, তাহলে পরমপুরুষ যা ভাল বুঝবেন তা-ই করবেন। তবে একথা ঠিক, এই শ্রেণির ভক্তরা কখনও পরমপুরুষকে কোন দিন কাছে পাবে না কারণ সে তো পরমপুরুষকে চায়নি। যখন চায়নি তখন নিশ্চয়ই তা' সে পাবে না। মা রান্না করছেন, শিশু চীৎকার করছে। ছোট্ট ছেলে— মা তাকে একটা খেলনা দিয়ে, লাল রঙের কোন একটা জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে বসিয়ে রেখে আবার কাজ করতে চলে গেলেন। কিন্তু শিশু যদি জেদি হয়, খেলনা না নিয়ে সে যদি কেবল মাকেই চায়, তখন মায়ের মহা মুশকিল। কিছুক্ষণের জন্যে রান্না বন্ধ রেখেও ছেলেকে নিয়ে ভোলাতে হবে। আদর করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। নইলে চীৎকার করে সে পাড়া মাত করবে। পাড়ার লোকেরা বলবে, 'কী রকমের মা রে বাবা! ছেলের দিকে তাকায় না!" যারা চায়— শত্রু নিপাত করে দাও, নারায়ণ তার শত্রু নিপাত করুন আর নাই করুন, সে পরমপুরুষকে পাবে না। এতে কোন সংশয় নেই। সুতরাং চাওয়াটা খুব সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করতে হবে। আবার কেউ কেউ বলে— না, না, শত্রুর নিপাত চাই না, আমার খুব উন্নতি হোক, আর্থিক উন্নতি হোক, চাকরি-বাকরির উন্নতি হোক। চাকরি-বাকরির উন্নতি চাইছে, এমন লোকও তো অনেক রয়েছে— সেক্ষেত্রে কাকে রেখে কাকে নেবেন! ওপরের পোস্ট বা পদ একটাই— সেটা কাকে দেবেন, কাকে দেবেন না! তিনি সেক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী হয়তো ব্যবস্থা করে দেবেন। তা যা চাওয়া হচ্ছিল তা, সে পেতেও পারে, নাও পেতে পারে। তবে একথা ঠিক, সে পরমপুরুষকে পাবে না কারণ সে তো পরমপুরুষকে চায়নি। প্রথমোক্তটায় যারা শত্রুর নিপাত চায়, তাদের বলা হয় তামসিক ভক্ত। আর যারা চায়— আমার এই উন্নতি হোক, তারা তামসিক ভক্ত নয়, কারণ তার চাওয়ায় অপরের ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু তারা যে জিনিসটা চাইছে, সেটা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। মানুষের কাছে তার স্বার্থটা যখন খুব বড় হয়ে ওঠে তখন যুক্তি তার কাছে থাকে না। এরা হ'ল রাজসিক ভক্ত।

এর চেয়েও উঁচু দরের ভক্ত আছেন তাঁরা বলেন, "কিচ্ছু চাই না, হে নারায়ণ এবার মুক্তি দাও। আবার কেন! কারণ, আর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, পৃথিবীতে থেকে লাভ কী?" এখন পরমপুরুষ যদি শরীরটা একটু ভাল করে দেন, তখন তার মতিও বদলে যেতে পারে।

এর চেয়েও উঁচু দরের ভক্ত আছেন তাঁরা বলেন, "কিচ্ছু চাই না, হে নারায়ণ এবার মুক্তি দাও। আবার কেন! কারণ, আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, পৃথিবীতে থেকে লাভ কী?" এখন পরমপুরুষ যদি শরীরটা একটু ভাল করে দেন, তখন তার মতিও বদলে যেতে পারে। "শরীর ভাল হলেও কিছু হজম হচ্ছে না, কিছুই খেতে পাচ্ছি না, ঝোল-ভাত খেয়ে আছি, ভাল-মন্দ খেতে পাচ্ছি না।" ❑

'আনন্দ বচনামৃতম্' থেকে সংকলিত।

# আবরণ

গোপীনাথ কবিরাজ

প্রশ্ন: পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে না কেন।

মা: অবজ্ঞা, জ্ঞান নাই, আবৃত আছে বলে।

প্রশ্ন: আবরণই বা হয় কেন? মৃত্যুর পরও মন থাকেই, কেননা সংস্কার থাকে মনে। আর সংস্কারগুলি থেকেই যায়, আজকের কথা কালকের কথা মনে থাকে— জন্মান্তরের কথা ভুল হবে কেন?

মা: ভুলের রাজ্যে এসে সব ভুল হয়ে যায়। এটা যে ভুলেরই জায়গা।

প্রশ্ন: এতটা ভুল হয়ে যাবে, একটুও ত মনে থাক।

মা: তোমরাই ত বল, বুদ্ধ ৫০০ জন্মের কথা বলেছেন। ছেলেবেলা থেকে এখন পর্যন্ত তোমার যে বয়স হয়েছে— এই জন্মের এই সমস্ত কথা মনে করতে পার? প্রতি পলে তোমার মৃত্যু হচ্ছে তোমার জানা নেই— এখন তোমার বাল্য নাই, শৈশব নাই, যৌবন নাই। ছোট ছেলে জন্মাবার পর হতেই আপনা আপনি দুধ খেতে লাগল। আর খেতে আনন্দ, খেলে পেট ভরে যায়— এতে পূর্বজন্মের পুরা প্রমাণ দিচ্ছে। ছোট ছেলের খেয়ে যে এই আনন্দ— আমার হতো— এখনও তাই হচ্ছে। কিন্তু কথা এই মনে থাকছে না।

যেখানে ভ্রম আর অজ্ঞান সেখানে ভুল ত থাকবেই। এর মধ্যে নিজেকে পাওয়ার দিকে যখন সাধনা কর, বা কৃপা পেয়ে যখন সাধনা হয়— সাধনামাত্রেই কৃপা— তখন কত স্তর পার হ'য়ে দেখতে পাও আমি ত সমগ্র রূপে। আমি আছি তবেই না গাছপালা যত ইতি।

প্রশ্ন : সংস্কার কেমন থাকে?

মা: অভ্যাস যোগ। ভগবানের জন্য চেষ্টা করে যাও, মৃত্যু সময় আপনা হতে স্মরণ এসে যাবে। জীব যে বদ্ধ; জগৎ-গতি। এই জীব জগতের মধ্যে যা প্রকাশ এক তারই প্রকাশ পলে পলে যে তোমার মৃত্যু হচ্ছে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের প্রকাশ হচ্ছে এইরূপে দেহান্ত করে প্রমাণিত করছে— ভুল জগতে যখন বিচরণ করছ তখন ভুলতেই হবে।

সংস্কার— যেমন মন্দির সংস্কার অর্থাৎ যা ছিল তারই প্রকাশ। আর এক কথা, তোমার মনে থাক্ বা না থাক্ সমস্তটারই একটা ছাপ থেকে যায়। একেই বলে সংস্কার। যার যোগ্যতা আছে, দেখতে পারলে দেখতে পাবে পূর্বজন্মের এই সংস্কার বা ছাপ। যে জ্ঞানী সে কত জন্মের সংস্কার দেখতে পারে। নিজের লক্ষ জন্মই বা দেখলে কিন্তু যেখানে অনুলোম বা বিলোম প্রকাশ সেখানে কি দেখবে?

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে গাছপালা কীটপতঙ্গ যেখানে যা কিছু আছে তাদের জন্ম তোমারই জন্ম; তাদের মৃত্যু তোমারই মৃত্যু। যেখানে তোমার মধ্যে সব, সবের মধ্যে তুমি— এখানে এক ঐ ইত।

যদি পাঁচ জন্ম দেখতে পার এখানে সংখ্যা দৃষ্টি। তোমার পূর্বজন্মের history এ'ত তোমার দেশ-কাল-গতির মধ্যে স্রেফ আপনার জন্যই দেখছ, কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যে নানা স্থিতি রয়েছে তার ত প্রকাশ নেই, 'নানা' তুমি যে দেখছ এই নানা মিটবে কি করে? নানার মধ্যে আপনাকে পেলে। কে?— ঐ একমাত্র। যতক্ষণ এর প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত boundary রয়ে গিয়েছে।

Boundary মানে অজ্ঞান, কাজেই ভুল।

প্রশ্ন: আপনি কি ঈশ্বরকোটিতে যাবার কথা বলছেন?

মা: ঈশ্বরকোটিতে যাওয়ার কথা হয় না। যতক্ষণ আবরণ থাকে ততক্ষণ হয় না। ঈশ্বরকোটি কি সাধন কোটি এটার ভাগ করে তোমরা নাও।

প্রশ্ন: যে আত্মস্থিত তার ত জগৎ ভুল হবেই।

মা: ভুলের রাজ্য ভুল। যখন দেহ ব'ল তোমার আকারটাই হল 'দেও দেও'। দেও মানে অভাব আছে। অভাব যেখানে সেখানে ভ্রান্তি, অজ্ঞান। যেখানে ভ্রম আর অজ্ঞান সেখানে ভুল ত থাকবেই। এর মধ্যে নিজেকে পাওয়ার দিকে যখন সাধনা কর, বা কৃপা পেয়ে যখন সাধনা হয়— সাধনামাত্রেই কৃপা— তখন কত স্তর পার হ'য়ে দেখতে পাও আমি ত সমগ্র রূপে। আমি আছি তবেই না গাছপালা যত ইতি। যত রূপ হয়েছে সে ত আমিই। যেখানে আমিই সেখানে আমার প্রকার অনন্তভাব, অনন্ত প্রকাশ। এই যে আর সব আকার রয়েছে সবই ত অনন্ত। তাহলে আমিও অনন্ত। ❑

'আমি মা আনন্দময়ী বলছি' থেকে সংকলিত।

# ঈশ্বর

শ্রী অর্চনাপুরী মা

প্রশ্ন— অনেকেই প্রশ্ন করে, আমরা যদি সামাজিক দিক থেকে সৎভাবে নৈতিক পথ অবলম্বন ক'রে চলি তাহলে আর আলাদা ক'রে ভগবানকে ডাকার বা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কি প্রয়োজন আছে?

উত্তর— প্রথম একটা কথা মনে রাখতে হবে,— সদ্ভাবে অনেকেই হয়তো চলে, ভগবানকে বিশ্বাস না ক'রে বা ধর্ম ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে। যেমন, পাশ্চাত্যে মানুষ সামাজিক বোধকে জাগ্রত রেখে সদ্ভাবে হয়তো জীবনযাপন করে। এ ধরনের বেশির ভাগ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই অজ্ঞান। ভগবানকে না ডাকলে ভগবানের দিক থেকে কোনও আপত্তি আসবে বলে মনে হয় না।

তবে একটাই প্রশ্ন— সেটা ভারতবর্ষে সম্ভব হবে কি? ধর্মকে বাদ দিয়ে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে সদ্ভাবে সুস্থ সমাজজীবন গড়ে তুলতে আমরা পারব কী? সুস্থ সমাজজীবন গড়ে তুলতে গেলে প্রত্যেকটি মানুষকে সৎ হতে হবে। সেটা যে সম্ভব হচ্ছে না, তা বর্তমান ভারতবর্ষের বিশেষ ক'রে পশ্চিমবাংলার একটা বিরাট গোষ্ঠী ভগবানের অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে, প্রাচীন হিন্দু ধর্মের জীবনচর্যাকে অস্বীকার ক'রে নতুন একটা সমাজজীবন গড়ে তুলতে চাইছে। কিন্তু চরম দুর্নীতি ও বিশৃংখলা ছাড়া তার কোনও একটা দানা-বাঁধা রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা ঈশ্বর মানছেন না বা প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রেখে বা ভুলে গিয়ে জীবনযাপন করতে চাইছেন তাঁরা বুকে হাত দিয়ে কি বলতে পারেন যে, তাঁরা মনে-প্রাণে সদ্ভাবে নৈতিকতা নিয়ে সমাজের সেবা করতে পারছেন? 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— এই মন্ত্রটাকে তাঁরা বড় ক'রে দেখছেন নিজেদের স্বার্থকে গৌণ করে?

> আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন— 'সব সময় মনে রাখবেন, একটি সর্বোত্তম তত্ত্ব তোমাদিগকে লক্ষ্য করছেন।' এখানে ঈশ্বর বা ধর্মের একটা সর্বজনীন বা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে— যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে বা কিছুটা ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাদের ভেতরেও কি অন্যায় অসত্য নেই? তার উত্তর এই যে, মুখে ঈশ্বর বিশ্বাসের বুলি নিয়ে যারা অন্যায় আচরণ করে, তাদের কিন্তু ধর্মাত্মা বলা যায় না। কারণ, ধর্ম তাদের আত্মায় গ্রথিত হয়নি। ধর্মের মুখোশ পরে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা অভ্যাসবশত তারা ধর্মাচরণ করে। কিন্তু এখানেও আমার বলার আছে যে, ধর্মকে যাঁরা অভ্যাসের বশে বা কিছুটা স্বার্থসিদ্ধির জন্য আঁকড়ে রয়েছেন তাঁরা কিন্তু একেবারে যারা ধর্মহীনভাবে উচ্ছৃংখল জীবন-যাপন করছে তাদের তুলনায় অনেক ভাল।

হিন্দু ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্যই হল যে, এই ধর্ম মানুষের মধ্যে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় বোধটি জাগিয়ে দেয়, ঠিক পথটি ধরিয়ে দেয়। ধর্মকে যদি আমরা কিছুটাও ধরে থাকি, তাহলে যতটুকু ধরে থাকব ততটুকু আমরা অন্যায় থেকে সরে আসবার নির্দেশ অন্তর থেকে অনুভব করব। যেমন, বাড়িতে মাথার ওপর কোনও অভিভাবক না থাকলে ছেলের উচ্ছৃংখল হওয়াটা যত সহজ হয়, একজন সৎ মহৎ অভিভাবক মাথার ওপর থাকলে উচ্ছৃংখল হওয়াটা অত সহজ হয় না। ধর্ম বা ঈশ্বর হচ্ছে একটি সর্বোত্তম তত্ত্ব। আমাদের ঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন— 'সব সময় মনে রাখবে, একটি সর্বোত্তম তত্ত্ব তোমাদিগকে লক্ষ্য করছেন।' এখানে ঈশ্বর বা ধর্মের একটা সর্বজনীন বা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই সর্বোত্তম তত্ত্বটিকে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ নানাভাবে রূপ দেয়, পূজা করে। ঈশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে যে পবিত্র অনুষ্ঠানগুলি তারা পালন করে, সেগুলির মাধ্যমে তাদের মন অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও একটা অতিজাগতিক দিব্য শান্তিতে ভরে থাকে। সেটা যারা ঈশ্বর অবিশ্বাসী তারা কোনওদিনই অনুভব করতে পারবে না। কারণ, এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। ঈশ্বলাভের পরম আনন্দ ও শাশ্বত শান্তির অবস্থা সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। কাজেই এ চাহিদাও তাদের জাগে না। পাশ্চাত্যের যে সমস্ত দেশ শুধু ভোগমুখী সমাজবাদ নিয়ে সমাজকে গড়ে তুলেছেন, তারা নতুন ক'রে আজ পুরাতন। ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছে। ভোগ ক'রে তারা শান্তি পেয়েছে কি? অনেকেই স্বীকার করেছে যে— না, তারা সুখ পায়নি। শুধু তাই নয়, তারা পুরাতন ভারতের ধর্মের কাছে শান্তির উপাদান সংগ্রহ করতে ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে আসছে। ❑

'ছড়ানো মুক্তো' থেকে সংকলিত।

# গীতায় জন্মান্তর রহস্য

মহর্ষি প্রেমানন্দ

জন্মান্তর তত্ত্বের মূল রহস্য উদঘাটন করিতে যাইয়া গীতা বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ (গীতা- ৮/৬)

(মৃত্যুকালে হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে সর্বদা তদ্ভাব– ভাবিত দেহ প্রাপ্ত হয়)।

আমরা সাধারণত মনে করি যে, হিন্দু অধ্যাত্ম-দর্শন ব্যতীত অপর সকলেই জন্মান্তর তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। ঈশ্বরকে একটি শক্তি বা তেজরূপে এবং এই বিশ্বকে সেই শক্তিজাত বলিয়া স্বীকৃতি দিয়া জন্মান্তর তত্ত্বকে অস্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নহে। অধ্যাত্ম-দর্শন একটি সুউচ্চ ও সূক্ষ্ম পদার্থ-বিজ্ঞান। জন্মান্তর-তত্ত্বকে অস্বীকৃতি দেওয়া অর্থ এই পদার্থবিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা। গীতার ৭ম হইতে ১১শ অধ্যায় পর্যন্ত এই পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়ই বিশদ বিবৃত হইয়াছে।

লক্ষ লক্ষ তনুমানব মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে ক্লান্তির শেষে বিভ্রান্তির আশায়। লক্ষ্য যার স্থির, সন্ধান যার অব্যর্থ, ব্যর্থ হয় না তার অভিযাত্রা। তেমনি ভাব তাকে লইয়া যায় ভব-ভবন হইতে ভবাধীশের কাছে।

যে দর্শন বিজ্ঞানানুগ নহে উহা যুক্তিহীন ও ভ্রান্তিমূলক। জগতের কোন দর্শনই অযৌক্তিক বা ভ্রান্তিমূলক নহে। প্রত্যেকেরই অন্তর্নিহিত মূল ভাবধারাকে সম্যক বুঝিতে না পারিলেই বিভ্রান্তিকর মনে হয়। খ্রিষ্টান ও ইসলাম-দর্শন অধ্যাত্ম সাধনায় কেবলমাত্র রাজযৌগিক ধারাকেই সম্যক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জন্মান্তরবাদকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নাই। জন্মান্তরবাদে প্রশ্রয়শীল চিত্ত জীবন্মুক্তির জন্য অধ্যাত্ম সাধনায় ঐকান্তিকতায়ও দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলে। এবং এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মে আধ্যাত্মিক চরম উপলব্ধিতে জীবনকে সফল করিতে হইবে এমন একটা দৃঢ় মনোভাবের অভাব ঘটে। তদুপরি রাজযোগী জন্মান্তরের ভরসায় বসিয়া থাকে না বা বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহার "সহজ" বা স্ব-ভাবজাত অধ্যাত্ম কর্মের বলে (ক্রিয়াযোগে) অনন্ত জন্মমৃত্যুর রহস্যকে নিজ করায়ত্ত করিয়া লয়। তাহার মূল কিংবা সূক্ষ্মদেহ পরমের তেজ-সত্তার বলে নিয়ন্ত্রিত হইলেও এ জগতে যাতায়াত থাকে তার স্বেচ্ছাধীন। ইহাই মনের মাঝে সৃষ্টি করে তরঙ্গ। এই তরঙ্গই পরিচালিত করে জীবনকে। ইহাই পরমের তেজসত্তা, বিদ্যুৎ-তরঙ্গাকারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে বিশ্বকে।

এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের অভিব্যক্তি, ক্রিয়মানতা, বিশ্বপ্রসবিনী ও নিয়ন্ত্রণী শক্তি এবং তৎসংলগ্ন কারণ। বা পারমাণবিক জগৎ— এ সকলই সূক্ষ্ম ও সুউচ্চ পদার্থবিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। অধ্যাত্ম সাধনায় নির্বাসনায় নিষ্মনা হওয়ার অর্থই হইল ইচ্ছা সংঘাতে মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রজনন রোধ। এই ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের সমষ্টিই সংস্কার। উহারাই আত্মার বন্ধনের কারণ। বাসনাবিদগ্ধ মনের ক্রিয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সমষ্টিজাত হইয়া বলয়াকারে আত্মাকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণায়মান থাকে। আত্মা হইতে জাত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পরিমাপক নহে বলিয়া উহারা আত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে না। কিন্তু আত্মার চতুর্দিকে বলয়াকারে অবস্থিতি লইয়া আত্মিক ধর্মকে ব্যাহত করে। এই বলয়-বিশিষ্ট আত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণকালে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে উৎক্রান্ত হইতে পারে না। বিভিন্ন তির্যক পথে হয় তার গতি। এই বলয়াকৃতি সংস্কাররূপী (বাসনাসৃষ্ট) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সমষ্টিই আত্মার পৌনঃপুনিক দেহান্তর প্রাপ্তির কারণ।

অনিকেত হইয়া অনির্বিৎ। ব্যথা, ভীতি, সুখ, শোকের সংস্কারে যখন আচ্ছন্ন হয় আত্মা, তখনই আত্মা দেহী হইয়া আসে দেহের মধ্যে। বিদেহী হইলেই বিশ্বাতীত। নীড়ের মধ্যেই ঝড়ের ভয়, নীড় ছাড়িয়া যখনই নীলিমায় তখনই নিবৃত্তি। সূক্ষ্মেই হউক আর স্থূলেই হউক সর্বত্রই আত্মার আশা নিয়ে বাসা বাঁধে। আবার আশার জন্যই বাসা বদল। একবার ছুটিয়া আসে কেন্দ্র হইতে প্রসারতায়, আবার ছুটিয়া যায় বিস্তৃতি হইতে বিন্দুতে। লক্ষ লক্ষ তনুমানব মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে ক্লান্তির শেষে বিভ্রান্তির আশায়। লক্ষ্য যার স্থির, সন্ধান যার অব্যর্থ, ব্যর্থ হয় না তার অভিযাত্রা। তেমনি ভাব তাকে লইয়া যায় ভব-ভবন হইতে ভবাধীশের কাছে। ❑

'গীতায় ভগবান' থেকে সংকলিত।

# গেরুয়ার সাইনবোর্ড

স্বামী শিবানন্দগিরি

প্রশ্ন উঠেছে, সাধুতা অন্তরের বস্তু। গেরুয়া কাপড় পরে, ভস্ম বিভূতি মেখে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন কী? এটা আত্মপ্রচার নয়? আমি নিজে গেরুয়া পরে দেখলাম, গৈরিক বস্ত্র দেখে তিনজন প্রণাম করলে ত্রিশ জন জুতো মারে। পথেঘাটে চলতে ফিরতে ঠাট্টা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা সইতে হয়। ভিক্ষা হয়তো জোটে, কিন্তু যে-ই ভিক্ষা দিক ভিক্ষা দিচ্ছে এটা জানিয়ে দেয়। দিল্লি, কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, রানাঘাট, দুর্গাপুর, বিষ্ণুপুরে সন্ন্যাসী দেখলে মানুষ আগে সন্দেহ করে। অবিশ্বাস করে। নিশ্চিত প্রতারক জেনে অপরকে সাবধান করে। গুজরাটের গ্রামে হেঁটে ঘুরে শিখে এসেছিলাম, একটি গাধার গায়েও যদি গেরুয়া কাপড় জড়ানো থাকে, তাকেও প্রণাম করতে হবে। কারণ সে প্রণাম গাধাকে নয়, গৈরিক বস্ত্রকে। মায়ের রজবস্ত্র শিব দিয়েছেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা দিয়েছেন সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী কে? যারা কানে প্রেষমন্ত্র দিয়েছেন। ওই মন্ত্র কানে গেলে নর নারায়ণো ভবতি। অতএব নারায়ণকেই ওই বস্ত্র দিয়েছেন ব্রহ্মা। যে মানুষ বলেছে, ওম্ ভূঃ সন্ন্যাসত্বং ময়া। ওম্ ভুবঃ সন্ন্যাসত্বং ময়া। ওম্ স্ব সন্ন্যাসত্বং ময়া। ওম ভূঃ ভুবঃ স্ব সর্বম্ সন্ন্যাসত্বং স্বাহা। এই বলে যে সর্বস্ব অর্পণ করেছে, সেই নরই নারায়ণ। সেই নরই গেরুয়ার অধিকারী। তাই এক গৈরিকধারী অন্য গৈরিকধারীকে দেখলে বলে, ওম্ নমো নারায়ণায়। এটি নারায়ণের বীজ মন্ত্র, শুধু প্রণাম মন্ত্র নয়। কলকাতায় এসে দেখলাম, গেরুয়া আমার সাইনবোর্ড। এই সাইনবোর্ড দরকার। ডাক্তারের চেম্বারের সামনে লিখতে হবে, এখানে ডাক্তার আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, পেয়াদার তকমা চাই। তবে তার নোটিস আদালতের ঘোষণা বলে মানবে মানুষ। চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পুলিশটি হাত দেখাচ্ছে। গভর্নরের গাড়িও সে নির্দেশ মানতে বাধ্য। পুলিশের পোশাক তাকে চিনিয়ে দিচ্ছে সে পুলিশ।

তাই সুস্থ নাগরিক গেরুয়া দেখে মারতে আসে। একজন সৎ সন্ন্যাসী সমাজের মুখ উজ্জ্বল করে। আর বিপথগামী সন্ন্যাসী সমগ্র সন্ন্যাসী-ভাবমূর্তিকে বিকৃত করে।

রাস্তার মোড়ে একটা রিকশাওয়ালা বসে আছে। রিকশার উপর বসা মানুষটাকে দেখেই তুমি চিনে নিলে সে রিকশাওয়ালা। সে বোঝা তোলার দায়িত্ব নিয়েছে, প্রয়োজন হলে সে তোমাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে। তুমি নির্ভয়ে ওর রিকশায় উঠে আত্মসমর্পণ করতে পার। হে নকল রিকশাওয়ালা শুনে রাখ, তোমার দুটো কবজির উপর ভর করে যে মানুষটি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে তুমি সত্যিই রিকশাওয়ালা কি না সে কথা বুঝতে তার মুহূর্তও বিলম্ব হবে না। কোনও সার্টিফিকেট নিয়ে রিকশাওয়ালা হওয়া যায় না। প্রত্যেকদিন পরীক্ষা দিতে হয়। গেরুয়া ধারণ করলে তোমাকে প্রত্যেকদিন নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে— তুমি সন্ন্যাসী। গেরুয়া কাপড়ের সাইনবোর্ডে লেখা আছে, এটি একটি ফার্স্ট এড সেন্টার। প্রাথমিক সাহায্য দেওয়াই তোমার কাজ। পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার জন্যে তাকে পাঠাতে হবে হাসপাতালে। বড় দুর্ঘটনা ঘটলে তোমার ফার্স্ট এড বক্স নিয়ে নিজের তাগিদেই ছুটে যেতে হবে। ওটি তোমার ব্রত। কিন্তু, তাই বলে সুস্থ সবল নগরবাসীর দরজায় গিয়ে বলা চলবে না, ফার্স্ট এডের দরকার আছে? যার হাত কেটেছে আয়োডিন পেলে সে খুশি হবে। দুঃখ এই, আমার ফার্স্ট এডের বন্ধুরা ওই কথা ভুলে গিয়ে মানুষের দরজায় অকারণে কড়া নাড়ে, বিরক্ত করে। বলে, আপনাদের সাহায্য করতে আমাদের সাহায্য করুন। তাই সুস্থ নাগরিক গেরুয়া দেখে মারতে আসে। একজন সৎ সন্ন্যাসী সমাজের মুখ উজ্জ্বল করে। আর বিপথগামী সন্ন্যাসী সমগ্র সন্ন্যাসী-ভাবমূর্তিকে বিকৃত করে। ❑

'আমার ছোট্ট সমুদ্র' থেকে সংকলিত।

# গুরু

স্বামী অশোকানন্দ

অবশ্য গুরু-অন্বেষণ খুব সাবধানে করতে হবে। সকলেই তো গুরু হতে পারেন না। আবার শিষ্যও সবাই হতে পারে না। গুরু ও শিষ্যের উপযোগী গুণাবলি থাকা চাই। ভগবানলাভে আগ্রহশীল, জগতের ক্ষণস্থায়িত্বে বিশ্বাসী, জাগতিক ব্যাপারে নিরাসক্ত, এবং বিবেক বৈরাগ্যপূর্ণ ব্যক্তির কথাই আমরা এখানে বলছি। তেমন লোকই শিষ্য হওয়ার অধিকারী। গুরু সম্বন্ধে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, ভগবানলাভ করেছেন, এ রকম ব্যক্তি দুর্লভ। দশ লক্ষে একজনও সত্যোপলব্ধি করেছেন কিনা সন্দেহ। আবার যিনি ভগবানলাভ করেছেন, তাঁর উপব্ধির বিষয় গুপ্ত রাখা তিনি বেশি পছন্দ করেন। এ কারণে উপযুক্ত গুরু-নির্বাচন করা অতি কঠিন। তারপর আবার সকলে সকলরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করেন না। কেউ হয়ত বিষ্ণুরূপে দর্শন করেছেন, তিনি এক বৈষ্ণব সাধককে সাহায্য করতে সক্ষম। শক্তি উপাসক শাক্ত গুরুর শিষ্য হবেন। এতে নির্বাচনের পরিধি আরও সঙ্কীর্ণ হল। ভগবানলাভের পথ বহুবিঘ্নে পূর্ণ। একমাত্র দৃঢ় সংকল্পই এসব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করতে পারে। অজ্ঞতা হেতু আমাদের নকলগুরু দ্বারা প্রতারিত হওয়া সহজ। এও সত্য, আমাদের চারদিকে তাঁরা প্রচুর সংখ্যায় বর্তমান। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। সামান্য অলৌকিক শক্তি আমাদের বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। আর অলৌকিক শক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। কোন ফন্দিবাজ লোক বা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ধোঁকা দিয়ে আমাদের যে কোন একটা বাজে মতবাতে ভিড়িয়ে দিতে পারে। এতই বিশ্বাসপ্রবণ আমরা! অনেকে এই ফাঁদে পা দিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করেন। ফলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় এবং ধর্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। খাঁটি লোক চিনবার কয়েকটি লক্ষণ আছে। আন্তরিকভাবে ভগবানকে চাইলে, কোন ঝোঁকে পড়ে ধর্মানুশীলন না করলে, তাহলে আমাদের সহজাত প্রকৃতি বলে দেবে— যে মানুষটি নিজেকে গুরু বলে দাবি করেন তিনি অকৃত্রিম গুরু কিনা। আন্তরিকতা হবে আমাদের পথপ্রদর্শক। সহজাত প্রকৃতিই সব নয়। বিচারও কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিযোগ গ্রন্থে, গুরুর লক্ষণ ও গুণাবলির বর্ণনা করেছেন। এর চেয়ে ভাল উদ্ধৃতি আমাদের চোখে পড়ে না: তিনি বলেছেন, আমরা দেখব তিনি (গুরু) যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। ... যে গুরু শব্দ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের শক্তি দ্বারা চালিত হতে দেন; তিনি ভাব হারিয়ে ফেলেন... শাস্ত্রের মর্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাচার্য। শব্দ যোজনা, সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা ও শাস্ত্রমর্ম ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন উপায়— পণ্ডিতদের বিচার ও আমোদের বিষয়মাত্র, উহা দ্বারা অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয় না। ...জগতের কোনও প্রধান ধর্মাচার্যই এরূপ শাস্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যায় অগ্রসর হননি। শব্দার্থ ও ধাত্বার্থ নিয়ে ক্রমাগত মার-প্যাঁচ করেন নি। শুধু তাঁরা জগৎকে অতি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন।

...জগতের কোনও প্রধান ধর্মাচার্যই এরূপ শাস্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যায় অগ্রসর হননি। শব্দার্থ ও ধাত্বার্থ নিয়ে ক্রমাগত মার-প্যাঁচ করেন নি। শুধু তাঁরা জগৎকে অতি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময় লোকে বলে, 'গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন দেখার কি প্রয়োজন? তিনি যা বলেন, সেটি নিয়েই আমাদের কাজ করা আবশ্যক।' কথাটা ঠিক নয়। গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন পদার্থবিজ্ঞান শিখাতে হলে, শিক্ষক যাই হোন না কেন, কিছু আসে যায় না। কারণ ওতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চালনা— বুদ্ধি বৃত্তিকে কিঞ্চিৎ সতেজ করার প্রয়োজন হয় । কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আচার্য অশুদ্ধচিত্ত হলে, তাতে আদৌ ধর্মালোক থাকতে পারে না। ❑

'দেবত্বের সন্ধানে' থেকে সংকলিত।

'আত্মার মধ্যে পূর্ব হইতেই মহিমা, তেজ ও পবিত্রতা রহিয়াছে।' ... ব্যক্তই হউক আর অব্যক্তই হউক, ঐ শক্তি তোমাদের ভিতরে রহিয়াছে। ... সব শক্তি তোমাদের ভিতরে রহিয়াছে। ... তোমরা সব করিতে পার। ইহা বিশ্বাস কর। মনে করিও না— তোমরা দুর্বল। অপরের সাহায্য ব্যতীতই তোমরা সব করিতে পার।

—স্বামী বিবেকানন্দ

# চেতন, অবচেতন ও অধিচেতন

স্বামী বিবেকানন্দ

রামানুজ জগৎপ্রপঞ্চকে চিৎ (জীবাত্মা বা প্রাণী), অচিৎ (জড় প্রকৃতি) এবং ঈশ্বর— এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন; অথবা চেতন, অবচেতন ও অধিচেতন— এই তিন ভাগ। শঙ্কর কিন্তু বলেন : (জীবাত্মা) চিৎ ও (পরমাত্মা) ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এক বস্তু। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; ঐ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাঁর গুণ নয়। ব্রহ্মকে চিন্তা করতে গেলেই তাঁকে বিশিষ্ট করা হয়; তাঁর সম্বন্ধে বড় জোর বলা যেতে পারে 'ওঁ তৎ সৎ' — অথাৎ তিনি সত্তাস্বরূপ, তিনি অস্তিস্বরূপ— এই মাত্র।

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্তুর থেকে পৃথক করে দেখতে পারো? দুটি বস্তুর মধ্যে 'বিশেষ' বা পার্থক্য কোন্‌খানে? ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে নয়, কারণ তা হলে সব জিনিসই এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়জ্ঞান একটার পর একটা, এই ক্রমে হয়ে থাকে। একটা বস্তু কি, তা জানতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়, সেটা কি নয়। দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যে অবস্থিত, আর চিত্তে যা সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা এগুলি জানতে পারি। বস্তুর স্বরূপের মধ্যে ভেদ নেই, সেটা আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে। বাইরে এক অখণ্ড বস্তুই রয়েছে; ভেদ কেবল ভিতরে, আমাদের মনে; সুতরাং বহুজ্ঞান মনেরই সৃষ্টি।

এই 'বিশেষ' গুলিই গুণপদবাচ্য হয়— যখন তারা পৃথক্ পৃথক্ থাকে, অথচ কোন একটি জিনিসের সঙ্গে জড়িত থাকে। এই 'বিশেষ' জিনিসটা কি, তা আমরা ঠিক করে বলতে পারি না। আমরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখতে পাই ও অনুভব করি কেবল সত্তা বা একটা 'অস্তি' ভাব। আর যা কিছু সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বস্তুর সত্তা সম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি। বিশেষ বা ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য— যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, কারণ ঐ সর্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে; ভুলভাবে হলেও একটা কিছু তো দেখা যাচ্ছে। যখন রজ্জুজ্ঞান বাধিত হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীতক্রমে সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা মাত্র জিনিস দেখছ বলে প্রমাণিত হয় না যে, অন্য জিনিসটা নেই। জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু তার যে অস্তিত্ব আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। শঙ্কর আরও বলেন যে, অনুভূতিই (Perception) অস্তিত্বের চরম প্রমাণ। অনুভূতিই স্বয়ং জ্যোতিঃ ও আত্মসচেতন, কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে

না। অনুভূ
ইন্দ্রিয়
কারণ-সাপেক্ষে
সম্পূর্ণ নিরপে
(Conciousne
অনুভূতি হতে
না; ত
স্বপ্রকাশ, তা
নিম্নতর মাত্র
প্ র কা শ ে
'চেতনা' বলে
কোন প্রকার
অনুভব-ক্রিয়
চেতনা-রহিত
হতে পারে ন
চেতনা। সত্তা আর অনুভব এক বস্তু, দুটি পৃথক্ পৃথক্ ভাব একসঙ্গে জোড়া নয়। যার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই, তাই অনন্ত; সুতরাং অনুভূতি যখন নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অনন্ত স্বরূপ; অনুভূতি সর্বদাই স্বসংবেদ্য। অনুভূতি নিজেই নিজের জ্ঞাতাস্বরূপ; এটা মনের ধর্ম নয়, কিন্তু তা থেকেই মন হয়েছে; অনুভূতি নিরপেক্ষ, পূর্ণই একমাত্র জ্ঞাতা, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আত্মা। অনুভূতিই স্বয়ং অনুভব করে, কিন্তু আত্মাকে 'জ্ঞাত' বলা যেতে পারে না; কারণ 'আত্মা' বললে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে বোঝায়। কিন্তু শঙ্কর বলেন, আত্মা 'অহং' নন, কারণ তাঁতে 'আমি আছি' এই ভাবটি নেই। আমরা (অহংভাব) সেই আত্মার 'প্রতিবিম্ব' মাত্র, আত্মা ও ব্রহ্ম এক। ❑

অনুভূতিই স্বয়ং জ্যোতিঃ ও আত্মসচেতন, কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয় বা কারণ-সাপেক্ষে নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

'বেদবাণী' থেকে সংকলিত।

# জপ ও ধ্যান

অযাচক

জপ ও ধ্যান হ'ল সাধন-প্রয়াসের দুটি ভিন্ন ভঙ্গি মাত্র— আপতত এরা ভিন্ন, মূলত কিন্তু অভিন্ন। জপ হল মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধাপ্লুত আবৃত্তি। ধ্যান হ'ল সেই ক্রিয়ারই চিন্তন, মনন এবং ভাবনা-অংশ। জপের শেষাংশেতে ভাবনারূপে ধ্যান অবশ্যই এসে যায়, তা-না হলে জপ নিরর্থক রসশূন্য একটি প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায়। ধ্যানের পশ্চাতে আবার পৌণ-পৌনিকত্ব বিনষ্ট হ'লে ধ্যানের প্রবাহটি অনবচ্ছিন্ন থাকে না— তাই একই প্রয়াসের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির প্রয়োজন ধ্যানে থাকবেই থাকবে। জপকে ধরেই ধ্যান অনবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে, ধ্যানকে অবলম্বন ক'রে জপ সার্থকতা আহরণ করে। ফুলের মালায় ফুলগুলি যেন জপের প্রয়াস, আর সংযোগসূত্রটি হ'ল যেন ধ্যান-প্রয়াস। সেতারের তারগুলির উপর দিয়ে বার বার আঙুল বুলিয়ে যাওয়া জপ, কিন্তু তারই ফলে যে সুরের ঝঙ্কার ওঠে তাই হল যেন ধ্যান।

চিত্তের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াযোগের চেষ্টাকৃত এই অংশ লোপ পায় অথচ ক্রিয়া আপনা আপনি চলতে থাকে। দেহের চেষ্টা বিলুপ্ত হতে থাকে, বড় মনের চেষ্টাও বিলুপ্ত-প্রায় হয়, কিন্তু অন্তঃকরণে চেতনা অতিমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় এসে জপ ও ধ্যান উভয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে একটি অভিন্ন প্রবাহের আকার ধারণ করে।

ধ্যানকে তৈলধারাবৎ বলা হয়ে থাকে। অনেকগুলি তৈলবিন্দু একত্র সংযুক্ত হলে তবেই একটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি তৈলবিন্দু যেন একটি জপ-প্রয়াস। এই প্রয়াস যখন মানসলোকে একটি অনবচ্ছিন্ন প্রবাহের সৃষ্টি করে তখনই তা ধ্যান হয়ে ওঠে। দৃশ্যত ধারাটি অখণ্ড, কিন্তু আসলে তা অসংখ্য খণ্ডের সমষ্টি মাত্র। তাই স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেন, 'জপ ছাড়া ধ্যান হয় না, ধ্যান ছাড়া জপ অসম্পূর্ণ। জপ হল খণ্ডিত ধ্যান, ধ্যান হ'ল অখণ্ড জপ।' মহানাদ শ্রবণের মধ্যে দিয়ে ধ্যান স্বাভাবিক হয়ে আসে: মহানাদ হল অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন বিশ্বাতিগ ধ্বনি। তাতে মন লগ্ন করলে ধ্যান অতি সহজ হয়। আবার বলা হয়, ধ্যানপ্রবণতা বৃদ্ধি পেলে তখন অন্তঃকর্ণে মহানাদ স্বতঃই শ্রুত হয়। এই মহানাদ অনেকটা হাটের দূর-থেকে শোনা হো হো শব্দের মতন। দূর থেকে শুনলে একটি অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ বা ধারা হিসেবে তা মনে হয়। কিন্তু নিকটে গেলে শোনা যায়, আলু দাও, পটল দাও, টাকা দাও ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড বাক্য, ভাষা কত কি। ওগুলি হ'ল জপের এক একটি খণ্ড প্রয়াস। সেই প্রয়াসের অখণ্ড-মূর্তিটির নাম ধ্যান।

জপ ও ধ্যান পরস্পরের পরিপূরক— প্রতিযোগী নয়। রুচি, প্রকৃতি এবং গুরুদত্ত আদেশ অনুসারে বাহ্যত কেউ জপের উপর বেশি জোর দেন— তাই তাঁকে জাপক বলা হয়ে থাকে, আবার কেউ ধ্যানের উপর জোর দেন— তাই তাঁকে বলা হয় ধ্যানী। নামপন্থী হলেন জাপক, রূপপন্থী হলেন ধ্যানী। বোঝবার সুবিধার জন্য দুটিকে পৃথক করা হয়। অন্যথায়, সাধক হিসেবে তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক শ্রেণিভুক্ত হন না। অর্থাৎ কেউ সাধনপথে কোনও সময় ধ্যানের উপর জোর দেন, কোনও সময় জপের উপর জোর দেন। আবার কেউ কেউ একই সঙ্গে জপ ও ধ্যান চালান অর্থাৎ আসনে বসে আগে মন্ত্রজপ করে নেন, পরে ধ্যান; অথবা আগে ধ্যান ও পরে জপ ক'রে থাকেন। কিন্তু ঠিক জপক্রিয়া কালে চেষ্টাপূর্বক ধ্যানক্রিয়া করতে গেলে বা ধ্যানক্রিয়ার মুহূর্তে চেষ্টাপূর্বক জপের প্রয়াস চালাতে গেলে সাধন-বিপর্যয় ঘটে। অর্থাৎ জপের কালে মন থাকে শব্দে, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রিয়াযোগ হিসেবে যুগপৎ ধ্যান ও জপ করা বিধেয় নয়, যদিও তত্ত্বত ধ্যান ও জপের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

চিত্তের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াযোগের চেষ্টাকৃত এই অংশ লোপ পায় অথচ ক্রিয়া আপনা আপনি চলতে থাকে। দেহের চেষ্টা বিলুপ্ত হতে থাকে, বড় মনের চেষ্টাও বিলুপ্ত-প্রায় হয়, কিন্তু অন্তঃকরণে চেতনা অতিমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় এসে জপ ও ধ্যান উভয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে একটি অভিন্ন প্রবাহের আকার ধারণ করে। ❑

'জপ' থেকে সংকলিত।

# প্রার্থনা কেন করি

শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমা

মানুষের জীবন নিত্য অভাব, অভিযোগ ও প্রয়োজনে পরিপূর্ণ, সুতরাং তার কামনা থাকেই, কেবল দেহে প্রাণে নয়, কিন্তু মনে এবং আধ্যাত্মিক সত্তাতেও। যখন সে জানে যে জগৎ চলছে কোন উচ্চশক্তির নিয়ন্ত্রণে, তখন সে ঐ উচ্চশক্তির কাছে তার অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা জানায়, যাতে তার জীবনের বন্ধুর পথে ও কঠিন সংগ্রামে ভগবৎ সাহায্য ও আশ্রয় লাভ করতে পারে। ধর্মীয় রীতিতে ভগবানের কাছে যতই কেন স্থূলভাবে প্রার্থনা করা হোক, যতই কেন স্তবস্তুতির দ্বারা ও নৈবেদ্যদি উৎসর্গ প্রভৃতি ঘুষ দেওয়ার দ্বারা ভগবানের তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করা হোক, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক আস্পৃহা প্রায় কিছুই থাকে না, তথাপি এ কথা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে ভগবৎ প্রার্থনার প্রয়োজন আছে আমাদের সত্তার পক্ষে। প্রার্থনার যে কোন সুফল আছে এতে প্রায়ই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, বলা হয় যে তা অনাবশ্যক এবং নিষ্ফল। এ কথা সত্য যে বিশ্বনিয়ম তার আপন লক্ষ্যের পথে চলবে, কারো ব্যক্তিগত উপরোধে টলবে না, আর এ কথাও সত্য যে যিনি পরাৎপর তিনি তাঁর সর্বজ্ঞ শক্তিতে দেখতে পান যে কখন কি করা দরকার, তিনি মানুষের চিন্তা ও ব্যক্তিগত কামনার দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনোরূপে প্রভাবিত হতে পারেন না। কিন্তু তথাপি সেটা যান্ত্রিক নিয়ম নয়, সেটা জীবন্ত শক্তির ক্রিয়া এবং সেখানে মানুষের আস্পৃহা ও শ্রদ্ধাবিশ্বাসের স্থান নিতান্ত অনর্থক নয়। প্রার্থনা মানুষের সেই আস্পৃহা ও শ্রদ্ধাবিশ্বাসকেই একটা আকার দেয়। যদিও তা অনেক সময় নিতান্ত স্থূল ও ছেলেমানুষি হয়ে দাঁড়ায়, তথাপি তার মধ্যে একটা তাৎপর্য থাকে এবং কিছু প্রকৃতি শক্তিও থাকে। অর্থাৎ তা মানুষের ইচ্ছা ও আস্পৃহা ও শ্রদ্ধাকে ভগবানের চেতন ইচ্ছার সংস্পর্শে এনে একটা সচেতন ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপন করে। প্রথমে যদিও সেই সম্বন্ধ অহংবুদ্ধি প্রণোদিত হওয়াতে নিতান্ত নিম্নস্তরের হয়, কিন্তু তার পরে আমরা তার উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যে গিয়ে পৌঁছাতে পারি। তখন আর কি চাইছি তা নিয়ে কথা নয়, মানুষের জীবনের সঙ্গে ভগবানের চেতন সংস্পর্শ ও লেনদেন নিয়ে কথা। আধ্যাত্মিকের দিক থেকে এই চেতন সংস্পর্শের শক্তিমূল্য অনেক বেশি। জীবনে আমরা একান্ত আত্মনির্ভর হয়ে যে সংগ্রাম করি, প্রার্থনা তার মধ্যে একটা পূর্ণতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি এনে আমাদের শক্তি সমৃদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত সেই প্রার্থনা তার চেয়ে বৃহত্তর সম্বন্ধে গিয়ে বিলীন হয়, অর্থাৎ তার ভিতরকার আস্পৃহা ও শ্রদ্ধাবিশ্বাসই আনন্দের বস্তু হয়ে বড় হয়ে ওঠে। তার অর্থ তখন আরো উচ্চস্তরে গিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভক্তিতে উপনীত হয়, কোন দাবিদাওয়া ঘুচে গিয়ে তখন তা সহজ ও বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমে পরিণতি লাভ করে। মানুষের আত্মা ভগবানের কাছে চায় সাহায্য, চায় আশ্রয় এবং নির্দেশ, চায় সাফল্য— অথবা চায় জ্ঞান, চায় শিক্ষণ, চায় আলো,— কারণ তিনি জ্ঞানসূর্য,— অথবা সে চায় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনা অথবা জগৎযন্ত্রণা থেকে মুক্তি, অথবা তার ভিতরকার হেতু থেকে মুক্তি। মানব আত্মা তার সকল কামনা ও দুঃখের কথা জানায় ভগবতী মাতৃআত্মার কাছে, আর জগন্মাতাও তাই চান, যাতে তিনি তাঁর হৃদয়ের স্নেহ সেখানে ঢেলে দিতে পারেন। মায়ের ওই স্নেহ আপনা হতে আছে বলেই মানব আত্মা তার দিকে ফেরে কারণ সেখানেই আমাদের আপন গৃহ, জগতের পথে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সেই মাতৃহৃদয়ে গিয়েই আমরা বিশ্রাম পেতে পারি। নিছক যুক্তিবাদী লোকেরা বলবে, "প্রার্থনা কেন করবে? আস্পৃহার কি দরকার? কিছু তুমি চাইবে কেন? ভগবান যা করতে চান তাই তিনি করবেন এবং তাই তিনি করছেন।" অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু তথাপি এই যে প্রার্থনা "ভগবান তুমি প্রকাশ হও" এতে তাঁর অভিব্যক্তির মধ্যে একটা স্পন্দন জাগে। ❑

শেষ পর্যন্ত সেই প্রার্থনা তার চেয়ে বৃহত্তর সম্বন্ধে গিয়ে বিলীন হয়, অর্থাৎ তার ভিতরকার আস্পৃহা ও শ্রদ্ধাবিশ্বাসই আনন্দের বস্তু হয়ে বড় হয়ে ওঠে। তার অর্থ তখন আরো উচ্চস্তরে গিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভক্তিতে উপনীত হয়, কোন দাবিদাওয়া ঘুচে গিয়ে তখন তা সহজ ও বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেমে পরিণতি লাভ করে।

'প্রার্থনা ও মন্ত্র' থেকে সংকলিত।

# পুরুষ ও প্রকৃতি

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার মতে, পুরুষ ও প্রকৃতি দুই তত্ত্বও নহে, এক তত্ত্ব নহে। তাহারা একই পরম বস্তুর দ্বিবিধ প্রকাশরূপ। একই পুরুষোত্তমের দুইটি প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি জ্ঞাতা জ্ঞেয়তত্ত্ব বটে— কিন্তু এই সত্য আপাত। চরমে তাহারা উভয়েই জ্ঞেয় তত্ত্ব। ঘড়িটার কাঁটাগুলির চালক তার চাকাগুলি। কিন্তু স্প্রিংয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, চাকাও চালক নহে, সেও স্প্রিং দ্বারা চালিত। গীতায় পুরুষেরই নামান্তর পরা প্রকৃতি। প্রকৃতির অপর নাম অপরা প্রকৃতি। দু'য়ের জ্ঞাতা অপর একটি পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। পক্ষীর পক্ষদ্বয়ের কর্মক্ষমতা যেমন একটি পক্ষীর দেহে সংলগ্নতায়, পুরুষ প্রকৃতির সত্তা এবং সম্বন্ধ সেইরূপ এক পরমপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কতায়। পাখির অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইলে যেমন পক্ষদ্বয়ের উড়িবার সামর্থ্য বিন্দুমাত্রও থাকে না, সেইরূপ পরম পুরুষ হইতে পৃথক করিয়া ভাবিলে পুরুষ ও প্রকৃতির সত্তা, সান্নিধ্য ও সম্বন্ধ সকলই সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠে। দুইটি সরল রেখা কোনও একটি জমিকে সীমিত করিতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি তত্ত্বও বিশ্ব-বৈচিত্র্যের সুষ্ঠু সমাধানে সম্পূর্ণ অপারগ। যে দর্শন শাস্ত্রে self ও not-self -এর মূলে supreme self-এর সন্ধান নাই, man ও nature-এর মূলে God-এর বিদ্যমানতা নাই, সেই দর্শনশাস্ত্রের অবস্থা মাঝদরিয়ায় ডুবু ডুবু নৌকার মত।

পুরুষোত্তম ধরিয়া রাখেন জীবশক্তিকে, জীবশক্তি ধরিয়া রাখেন জগৎকে। শিবের অঙ্কে শিবানী, শিবানীর অঙ্কে সিদ্ধিদাতা।

শুধু প্রকৃতির পার্শ্বে পুরুষ, পুরুষই বটেন। কিন্তু এই দেখা সংকীর্ণ দেখা। ব্যাপক দৃষ্টিতে পুরুষোত্তমের পার্শ্বে পুরুষ ও প্রকৃতি। তখন তাহারা দুইই প্রকৃতি। পুরুষোত্তম, তাঁহার পরা প্রকৃতি ও তাঁহার অপরা প্রকৃতি— এই ত্রিভুজ তত্ত্বের উপর গীতার দার্শনিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত।

চন্দ্রের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগে ক্ষয়বৃদ্ধি বিচিত্রতাপূর্ণ তিথি সকলের উদ্ভব। এই কথাটি সত্য কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নহে। কথাটিকে পূর্ণাঙ্গ সত্য করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, তিথির বিচিত্রতার আপাত কারণ চন্দ্র ও পৃথিবী হইলেও মূল কারণ দিবাপতি সূর্য। বৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রপঞ্চের আপাত কারণ প্রকৃতি পুরুষের সম্মেলন। কিন্তু মূলীভূত হেতু হইল বিশ্বপতি পুরুষোত্তম। ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।/ প্রকৃতি বিদ্ধি যে পরাম্ ॥/ অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। এই সকল স্থলে 'মে' ও 'অহং', 'আমার' ও 'আমি' পদের লক্ষ্যীভূত বস্তুই পুরুষোত্তমই।

পরা ও অপরা প্রকৃতিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি কহিয়াছেন। এছাড়া আর একটি মহত্তর শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, যাহার নাম অন্তরঙ্গা শক্তি। এই শেষোক্ত শক্তি বলে ভগবান আপন স্বরূপে আপনি লীলাবিগ্রহরূপে বিরাজিত। যে শক্তির বিলাসে তিনি লীলাময় পুরুষোত্তম, সেইটি অন্তরঙ্গা শক্তি।

তটস্থা শক্তিই জীবশক্তি বা পরা প্রকৃতি। এই শক্তি দ্বারা তিনি অনন্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। "যদেদং ধার্য্যতে জগৎ।" আধার যেমন আধেয়কে ধরিয়া রাখে, সেইরূপ জীবশক্তি দৃশ্যপ্রপঞ্চকে ধরিয়া রাখে। পুরুষোত্তম ধরিয়া রাখেন জীবশক্তিকে, জীবশক্তি ধরিয়া রাখেন জগৎকে। শিবের অঙ্কে শিবানী, শিবানীর অঙ্কে সিদ্ধিদাতা।

জীবশক্তি কেবল জ্ঞাতা নহেন, ভোক্তাও বটেন। বহিরঙ্গা শক্তি জ্ঞেয়ই নহেন, ভোগ্যও বটেন। ভোক্তার জন্যই ভোগের সত্তা। ভোক্তার কর্মানুযায়ী ভোগ্য প্রকৃতির পরিণাম। জীবের কর্মই প্রকৃতির পরিণতির নিয়ামক।

এই ভোক্তা ভোগ্য উভয় এবং উভয়ের ভোগ পুনরায় পরমেশ্বরের ভোগ্য বস্তু। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর হইতেই নিখিল বিশ্বের উদ্ভব ও তাহাতেই লয়। তাহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। পুরুষোত্তম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক বস্তু আর অন্য কিছুই নাই। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি।" আমা অপেক্ষা পরতর অন্য আর কিছুই নাই। ❑

'গীতা-ধ্যান' থেকে সংকলিত।

# বিষ্ণুহরি, কৃষ্ণহরি ও ব্রহ্মহরি

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— আমরা কীর্তন হরি ওম্। বিষ্ণুহরি বা কৃষ্ণহরি নন, একেবারে ব্রহ্মহরি। কবীর সাহেবের রাম যেমন দশরথাত্মজ রাম নন, একেবারে ব্রহ্মরাম।

**ব্রহ্ম-গুরু**

গোস্বামী মহাশয়ের প্রশ্নের ফলে প্রসঙ্গ গুরুবাদের দিকে অগ্রসর হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু নয়, আমার গুরু ব্রহ্মগুরু। ব্রহ্মই গুরু, যিনি আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ, পবিত্রতা স্বরূপ, যিনি অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং সনাতনঃ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের পরমপ্রভু, যিনি সীমাতীত, অনাদি, অনন্ত, সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মই আমার গুরু।

যারা সাধন-ভজন করে না, শুধু শাস্ত্রই পাঠ করে, তারা কুতার্কিক, দাম্ভিক ও জ্ঞানগর্বী হয়ে পড়ে। পর-মতে দোষ-দর্শনের অনুচিত অভ্যাস তাদের এসে যায়। এজন্য সাধন করা ও শাস্ত্রপড়া এই দুইটি কাজ সমভাবে সমোৎসাহে করা উচিত।

**মানুষ-গুরু**

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— অবশ্য, মানুষ-গুরুরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ব্রহ্মগুরুর অভিমুখী হবার জন্যই মানুষ-গুরুর প্রয়োজন। মানুষ-গুরু শিষ্যকে যদি ব্রহ্মগুরুতে বিমুখ করে, তবে তাকে বর্জন কর্তে হবে।

**শিক্ষাগুরুর কর্তব্য**

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— শিক্ষাগুরুর কর্তব্য কি নূতন আর একটা মন্ত্র দেওয়া? নিশ্চয়ই না। পূর্বপ্রাপ্ত মন্ত্রটাকেই জীবন্ত ক'রে দেওয়া শিক্ষাগুরুর কর্তব্য। দীক্ষাগুরু মন্ত্র দিয়ে খালাস, শিক্ষাগুরু সেই মন্ত্রের প্রকৃত মহিমা শিষ্যের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে ঐ মন্ত্রেই তার নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর বাড়িয়ে দেবেন। এই আশাতেই ধর্মাচার্যেরা এক সময়ে শিক্ষা-গুরু প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে উল্টো। দীক্ষাগুরু যদি এক কান ফুঁকেছেন তবে শিক্ষাগুরু এসে আবার আর এক কানে ফুঁকবেন। এ এক অদ্ভুত ব্যভিচার। শিক্ষাগুরুরা শিষ্যদের মনকে এক পরিতাপযোগ্য দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। আসল উদ্দেশ্যই হ'য়ে গেল মাটি। জেলাবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে বটের ডাল লাগিয়ে তাঁকে বাঁচাবার জন্য জিওলের ডাল দিয়ে দেওয়া হ'ল বেড়া, ভাগ্যদোষে বটের ডাল গেল ম'রে, বেঁচে রইল ছায়াহীন পত্রহীন অখ্যাত জিওলের ডাল।

**পরোপদেশ আত্মোপকার**

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি চন্দ্রকুমার বাবুর বাড়িতে প্রত্যাগমন করিলে কতিপয় আমলাবাবু শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত ধর্মালোচনায় রত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি শুধু জীবহিতার্থেই লিখেননি। নিজেদের হিতার্থেও লিখেছেন, যে সত্যকে লাভ ক'রে জীব শান্তি পায়, সেই সত্য সকলকে অকাতরে বিতরণ করবার তার আগ্রহ হয়। আবার অপরকে সত্য বিবরণ কত্তে গিয়েও লোক নূতন নূতন সত্যের সাক্ষাৎকার পায়। জ্ঞানী ব্যক্তি অপরের অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য উপদেশ দেন, আবার অপরকে উপদেশ দিতে দিতে নিজের ভিতরে নূতন নূতন উপদেশের অনুভূতি লাভ করেন। শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন শুধু পরকে বুঝাবার জন্যই নয়, নিজেরা বুঝার জন্যও।

**শাস্ত্রপাঠের সুফল**

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— সকলেরই শাস্ত্রপাঠ করা সাধ্যমত উচিত। কারণ, শাস্ত্রবাক্য অনুভূত বিষয়ে idea (আভাস) দিয়ে সাধনোৎসাহ বাড়ায়। শাস্ত্রপাঠে নিজের সাধন-লব্ধ অনুভূতিগুলির সত্যতায় বিশ্বাস বাড়ে।

**সাধন-হীন শাস্ত্রপাঠ**

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— কিন্তু যারা সাধন-ভজন করে না, শুধু শাস্ত্রই পাঠ করে, তারা কুতার্কিক, দাম্ভিক ও জ্ঞানগর্বী হয়ে পড়ে। পর-মতে দোষ-দর্শনের অনুচিত অভ্যাস তাদের এসে যায়। এজন্য সাধন করা ও শাস্ত্রপড়া এই দুইটি কাজ সমভাবে সমোৎসাহে করা উচিত। ❑

'অখণ্ড সংহিতা' থেকে সংকলিত।

# The Statement of 'Advocacy Group for Mother Language Day Observance in Ontario School System'

Mahadev Chakravarty

Canada, the great country of ours, is the best country in the world for living. So we believe. Multiculturalism is Canada's official policy. Unity in diversity is what makes her unique.

Language is the main component of culture. Multiculturalism and multilingualism go together in a natural way. Vanishing language means vanishing culture. Vanishing culture means loss of wisdom accumulated through the ages. According to the UNESCO reports, every fortnight a language is dying out somewhere in this world. Obviously, the relevant culture is also dying out. The number of lost or dying out languages is unbelievably high. Due to the indifference or carelessness of various administrations the world over, hundreds of languages and cultures became extinct in the last century. Numerous books have been written to draw attention to this sad situation of the unnecessary demise of human cultures and languages.

21st of February' as International Mother's Language Day if no attempt is made to make the general population, young and old, aware of its significance.

UNESCO is also very much concerned about this matter and has declared the 21st of February as International Mother's Language Day. The date was chosen because of its historical significance in the struggle for preserving linguistic and cultural rights in the former East Pakistan (present-day Bangladesh). We, as individuals and as ethnic groups, need to be concerned as well. We must demand that our governments take positive actions to help all languages and cultures in the country to flourish.

The beauty of a flower garden is in the diversity of the blossoming flowers in the garden. Similarly, the beauty of our Canadian "society-garden" is in the cultural diversity of her population. Canada's official multiculturalism policy must be geared towards enhancing this beauty. Otherwise the policy would be meaningless.

In 2009, Ontario has declared 21st February as its own International Mother's Language Day, following in UNESCO's footsteps. However, the declaration alone is not sufficient to draw attention to the issue. Mass awareness is needed. In the school system, Remembrance Day is observed on November 11th every year to honor the memory of those killed in the two world wars. School children are made aware of the evil of war and of Canada's sacrifice in the attempt to stop that evil from spreading. Similarly, if International Mother's Language Day is celebrated in the school system, our younger generation will become aware of the global plight of endangered languages and cultures. They will also become conscious of their own cultural heritage, including their mother tongues (endangered or not), and will be proud of their own contribution to Canada's cultural mosaic.

To reiterate, it is useless to legislate the 21st of February' as International Mother's Language Day if no attempt is made to make the general population, young and old, aware of its significance.

This is not an issue tor any single group of people. All ethnic groups in Canada should be concerned in this matter. Survival of the cultural heritage of each ethnic group depends on this issue. So please, ask your MPPs to take action to implement the observance of International Mother's Language Day in the school system. ❑

# ওন্টারিও প্রদেশের স্কুল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য অধিবক্তা মন্ডলীর বিবৃতি

মহাদেব চক্রবর্তী

কানাডা আমাদের দেশ। এই মহান দেশ বসবাসের জন্য পৃথিবীতে সর্বোত্তম। আমরা তাই বিশ্বাস করি। বহুজাতিক সংস্কৃতির লালন এদেশের সরকারি নীতি। বৈচিত্র্যের ঐক্যে, বিভিন্নের অভিন্নতায় কানাডা বিশ্বে অনুপমেয়। সংস্কৃতির মূল উপাদান ভাষা। বহু সংস্কৃতির সাথে বহু ভাষার সহ-অবস্থিতি স্বাভাবিক।

কোনো ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানেই সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়া। সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার সাথে ঘটে বহুযুগ সঞ্চিত প্রজ্ঞার বিলুপ্তি। ইউনেস্কোর প্রতিবেদনে বলে, প্রতি পক্ষকালে (১৫ দিনে) পৃথিবীর কোনো না কোনো জায়গায় একটি করে ভাষার মৃত্যু ঘটছে। স্বভাবতই ঐ ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিরও বিলুপ্তি ঘটছে। এজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তির সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে অনেক বেশি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা বা অবহেলায় বিগত শতাব্দীতে এরকমের শত শত ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে। ভাষা ও সংস্কৃতির এই অনাবশ্যক অবলুপ্তির দুঃখজনক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেক বই লেখা হয়েছে। ইউনেস্কো এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই বিশেষ তারিখটি নির্বাচন করার কারণ বাঙালির অজানা থাকার কথা নয়। বাংলাদেশ নাম হবার আগে পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের সংগ্রামে প্রথম আত্মদান ঘটে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখ। বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এ তারিখের গুরুত্ব তাই অনেক।

২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃষাভা দিবস’ বলে সরকারি ঘোষণা নিরর্থক যদি যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে এর তাৎপর্য অবহিত করার চেষ্টা না করা হয়।

ভাষা ও সংস্কৃতির অনাবশ্যক অবলুপ্তির ব্যাপারে ইউনেস্কোর মতো ব্যক্তি-জাতি-গোষ্ঠী হিসেবে আমাদেরও উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কানাডায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতির লালন ও গৌরবিত বিকাশে ইতিবাচক কর্মব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে অবশ্যই আমাদের দাবি তোলা দরকার। একটি ফুল বাগানের সৌন্দর্য তার প্রস্ফুটিত পুষ্প সমাহারের বৈচিত্র্যে। তেমনি আমাদের কানাডার ‘সমাজ উদ্যানে’র সত্যিকার সৌন্দর্য এদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। বহু সংস্কৃতি লালন নীতি (মাল্টিকালচারাল পলিসি), যা সরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে বহুকাল আগেই, সার্থক হবে কানাডার এই সমাজ উদ্যানের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে। তা না হলে এই বহু সংস্কৃতি লালন নীতি অর্থহীন।

ইউনেস্কোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০০৯ সালে ওন্টারিও প্রাদেশিক সরকার ২১ ফেব্রুয়ারিকে নিজস্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। অবশ্য এই ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। স্কুল পর্যায়ে প্রতিবছর ১১ নভেম্বর ‘রিমেমব্রেন্স ডে’ পালিত হয়, গত দু’টি বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে এবং কানাডায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৃশংসতা ও যুদ্ধ থামানোর/শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টায় কানাডার ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। ঠিক তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃষাভা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি) স্কুল পর্যায়ে পালিত হলে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নব-প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্বজোড়া বিলুপ্তি শঙ্কাময় বিবিধ ভাষা ও সংস্কৃতির দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পাবে। উপরন্তু তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় আবেগ-আপ্লুত হয়ে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সচেতন হবে এবং কানাডার বহুজাতিক সংস্কৃতির ‘বৈচিত্র্য শিল্পে’ বা মোজেয়িকে নিজেদের অবদানে গৌরব বোধ করতে পারবে।

পুনর্বার বলি, ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃষাভা দিবস’ বলে সরকারি ঘোষণা নিরর্থক যদি যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে এর তাৎপর্য অবহিত করার চেষ্টা না করা হয়।

এ বিষয়টি কোনো এক বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সমস্যা নয়। কানাডার বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর এ বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক। প্রতিটি (অভিবাসী) জাতি-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঊর্ধ্বতন বা উত্তর জীবিতানির্ভর করছে এই বিষয়টির উপরে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

অতএব ২১ ফেব্রুয়ারিতে স্কুল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য আপনার স্থানীয় এমপিপি এবং সিটি কাউন্সিলরকে কার্যকরি পদক্ষেপ নেবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করুন, দাবি তুলুন।

আমাদের এই বহুভাষাভাষী, বহু সাংস্কৃতিক কানাডীয় সমাজে আপনার নিজস্ব মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির গৌরবিত ঐতিহ্য সম্মানের সাথে টিকিয়ে রাখতে আপনার দায়িত্ব পালন করুন। ❑

**BANGLADESH MINORITY RIGHTS ALLIANCE**
**TORONTO, CANADA**

**3699 St. Clair Ave. East, Toronto, ON, M1M 1T3,**
**Reg. No-1910196** **Phone: 647 267 6564, 416 451 7412, Email: bmra.toronto@gmail.com**

শরতের প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে দেবী দুর্গার বোধন করেছিলেন, সেই দুর্গাকেই আমরা হিন্দুরা যুগ-যুগ ধরে পুজো দিয়ে আসছি। মাতৃভূমি থেকে তাড়া খেয়েই হউক আর নিজের তাড়নায় হউক, সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে আসলেও, নিজেদের মনের ভিতরের অসুরদেরকে ফেলে আসতে পারিনি। তাই ঋতু পরিক্রমায় শরৎ এলে, অসুর বিনাশিনীকে, এই শান্তির প্রবাসেও আসতে হয় আমাদের মনের অসুরকে বধ করতে। আমরা আগমনীর আগমন কে উৎসবমুখর করে তুলতে কোন কৃপণতা রাখি না। টরন্টোতে শুধু বাংলাদেশী বাঙালিদের তিন তিনটি পূজার সব কটিতেই উপচে পরা ভিড়। কানাডায় আমরা সংখ্যালঘু হয়েও স্বাধীনভাবে শতভাগ নিরাপত্তায় ধর্মীয় উৎসবে, স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অপার আনন্দে, ভীতির ঊর্ধ্বে কয়েকটি দিন আমাদের কৃষ্টির মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকি।

সামাজিক নিরাপত্তার দেশে বসে, বর্তমান অবস্থান দিয়ে যতই মুছে ফেলার চেষ্টা করি, প্রায় প্রত্যেকেই জানি আমাদের ভেতরে আছে অদৃশ্য শেকড়ের টান, ফেলে আসা জন্মভূমি।

আমাদের কারোরই অস্বীকার করার উপায় নেই, জন্মভূমির মাটিতে আজ এই স্বাধীনতার স্বপক্ষের সরকারের শাসনে হাজার হাজার হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ ধর্মীয় আগ্রাসনের শিকার।

'৪৬-এর নোয়াখালী, '৫০-এর বরিশাল, বাষট্টির খুলনা। দ্বিজাতি তত্ত্বের বুকে লাথি মেরে অতঃপর স্বাধীন হলো দেশ ১৯৭১।

যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল দেশ। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে, অসাম্প্রদায়িকতাকে বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার শুরু। এর পর ধাপে ধাপে শুরু হয় সংখ্যালঘু ক্লিনজিং। দল-মতের মতপার্থক্য থাকলেও গনিমতের মালের ভাগবাটোয়ারায় সবাই এক। তবে আগে যা ছিল ধীরলয়ে চুপ-চাপ নীরবে, আজকাল তা হচ্ছে সরবে। এদেশে বড় হওয়া আমার আপনার সন্তান হয়তো কখনও জানবেই না, যে শেকড়কে নিয়ে আমরা গর্ব করি, যে নদীর মাটি আমাদের মাথার ভিতরে পাড় ভাংগে, স্মৃতিতে খেলা করে কাশবন, শরতের সাদা মেঘের ভেলা, যেখানে একদা সম্প্রীতি আদান-প্রদানের কাব্য চর্চা হত, সেই দেশে সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে, ধর্মান্ধদের উস্কানিতে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের সামনে নৃশংসভাবে খুন হচ্ছে কত মানুষের প্রিয়জন, ধর্ষণ থেকে রেহাই পায় না আট বছরের শিশু। এখানের প্রজন্ম, তাদের এসব না জানাই মংগল। জানলে তারা আৎকে উঠবে।

এখানে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে, নিজে ভালো আছি। আর বছরে একবার শারদীয় উৎসবের অপার আনন্দে নিমজ্জিত আমরা বাংলাদেশী হিন্দু এসব নিয়ে ভাবতেই চাই না। আর চাই না বলেই সাম্প্রতিক সময়ের অসংখ্য হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে টরন্টোর বিশাল হিন্দু কমিউনিটির পক্ষ থেকে তেমন কোন প্রতিবাদ সমাবেশ সংঘটিত করতে পারিনি। শুধু বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত আমরা প্রাণপণে ভুলে থাকতে চাই, আমাদের অনেকের দেখা নৃশংস অতীত। অপমানের জীবন।

কি দেশে কি প্রবাসে, নির্বিকার আমরা যেন ব্রহ্মার বরে সব সয়ে যাচ্ছি। দেশে আমাদেরই উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির এক বিরাট অংশ আছে যারা ক্ষমতার নিচে শুয়ে থাকা মেরুদণ্ডহীন। আর যুব সমাজের একটি অংশ সরকারের উচ্ছিষ্টভোগী, সংখ্যালঘু নাম ভাংগানো কিছু সংস্থা, সরকার ও প্রশাসনকে বাঁচিয়ে যতটা প্রতিবাদ করা যায়, তাই করে। তার পর নেতারা ছোটেন বঙ্গভবনে সরকারি আতিথেয়তায়।

জানি দেশে মুক্ত মত আর কলমকে স্তব্ধ করতে রক্তাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিপদসীমা আর কত লংঘন করলে, আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো। কানাডার মত দেশে নিরাপত্তার আঁচলে বসবাস করে, বুকবেঁধে সনাতনী ঐক্য দাঁড় করাতে পারবো? আর কত কাল আমরা সমাজ, আচার আর মন্দিরের চৌকাঠে মাথা ঠুকে ভগবানের কাছে বিচারের অপেক্ষা করবো?

এমনও তো হতে পারে ভগবান আমাদের অপেক্ষায় আছেন, কবে আমরা সনাতনী ঐক্য নিয়ে আওয়াজ তুলবো। এর জন্যে আমাকে– আপনাকে হিন্দু হতে হবে না, শুধু মানুষ হলেই চলবে। আসুন তবে মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়াই। প্রতিটি সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই।

বাংলাদেশ মাইনোরিটি রাইটস এলায়েন্স
টরন্টো, কানাডা-এর পক্ষে
হিমাদ্রী রায় সঞ্জীব
লেখক, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক কর্মী।

# CHIKUNGUNYA

[A new febrile outbreak in Asia esp. in Bangladesh & Africa]

Prof. Khokan Kanti Das

Chikungunya is an acute viral fever which spreads through bite of aedes mosquitoes during the day caused by the Chikungunya virus. It usually presents with

1. High fever lasting for few days, fever may be up to $104^0$ F or $40^0$ C/ very painful, hardly ever fatal. Patients suffer with mild to severe symptoms between 2-3 days with virus remaining in human system for roughly 7 days. During the time of infection any mosquitoes biting the infected person can become infected and pass along the diseases to others.
2. Joint pain with more affection in almost every patient to previous involved arthritic joints , symmetrical usually not inflamed at times very severe lasting for weeks, months at times years after fever is subsided some time very debilitating
3. Muscle pain
4. Headache
5. Nausea
6. Fatigue
7. Rashes

Most patients recover fully but in few cases in elderly patients it contributes to causes of mortality.

It shares some clinical features with dengue and Zika viruses. Laboratory investigation is nothing essential.

Treatment is symptomatic like paracetamol for fever & pain, plenty of fluids and just rest in acute phase.

The patient is most cases recovers completely.

Prevention of aedes mosquitoes in affluent places rather in odds and bites of mosquitoes in days rather at night by use of mosquito nets and repellents.

To allay anxiety, apprehension, panic & reassurance is the best part of therapy. ❑

Ex Professor & Head of Neurology, Ministry of Health & FP, GOPRB, Bangladesh.


*Shaaz Academy of Defensive Driving*

*Tel: 416-756-1044*

**আমাদের সেবাসমূহ–**

- আপনাকে একজন ক্যানাডিয়ান মানের দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করা
- ড্রাইভিং টেকনিকসমূহ আপনার কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ ও সহজ করা
- নূন্যতম সময় ও অর্থ ব্যয়ে টরন্টো থেকে লাইসেন্স পেতে সহযোগিতা করা
- আপনার প্রার্থীত সময়ে টেষ্ট বুকিং দেয়া

ব্যবস্থাপনায়ঃ
**অজয় বনিক**
**ব্যস্ত সড়কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণই**
**আমাদের প্রকৃত বন্ধু**
নিরাপদ ড্রাইভিং শেখার
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

## Bangladesh Canada Hindu Mandir

**Website: http://www.hindumondir.org** **Facebook: http://facebook.com/hindumondir**

## Puja/Broto List for Bangla 1425

| # | Puja/Broto | Date | Day | Tithi (Ontario Time) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Ganesh Puja** | **15 April** (01 Boishakh)<br>Sun rise 6:34 am & set 8:01 pm | Sunday | First day of the Bengali year |
| 2 | **Jogonnath Dev's Roth Jatra** | **14 July** (29 Ashar)<br>Sun rise 5:49 am & set 8:57 pm | Saturday | Dwitia till 6:32 pm |
| 3 | **Udoy-Osto Harinam Kirton** | **15 July** (30 Ashar )<br>Sun rise 5:49 am & set 8:56 pm | Sunday | Shukla Sunday of Uttarayon |
| 4 | **Shani puja & Satya Narayan Puja** | **21 July** (04 Shrabon)<br>Sun rise 5:55 am & set 8:51 pm | Saturday | Puja: Evening |
| 5 | **Jonmashtomi (Birth Tithi of Lord Krishna)** | **02 Sept**. (16 Vadro)<br>Sun rise 6:42 am & set 7:51 pm | Sunday | Oshtomi till 7:19 am of next day |
| 6 | **Vishwakarma Puja** | **17 Sept**. (31 Vadro)<br>Sun rise 6:59 am & set 7:24 pm | Monday | Month end of Vadro |
| 7 | **Pitri Torpon** | **07 Oct**. (20 Ashwin)<br>Sun rise 7:22 am & set 6:47 pm | Sunday | Pitripoxkhiyo Choturdoshi<br>Torpon: morning |
| 8(a) | **Durga Puja – Mohaloya** | 08 **Oct**. (21 Ashwin)<br>Sun rise 7:23 am & set 6:46 pm | Monday | Omabosya till 11:40 pm<br>Puja: Night |
| 8(b) | **Shoshtthee, BodhonAudhibas** | **14 Oct** (27 Ashwin)<br>Sun rise 7:30 am & set 6:35 pm | Sunday | Shoshtthee till 11:25pm<br>Puja: Evening |
| 8(c) | **Soptomee Puja** | **15 Oct** (28 Ashwin)<br>Sun rise 7:31 am & set 6:34 pm | Monday | Soptomee till 01:01 am of next day<br>Puja: 09:00 am |
| 8(d)<br>8(e) | **Oshtomee Puja**<br>**&**<br>**Sondhi Puja** | **16 Oct**. (29 Ashwin)<br>Sun rise 7:33 am & set 6:32 pm<br>**17 Oct**. (30 Ashwin) | Tuesday | Oshtomee till 2:56 am of next day<br>Puja: 09:00 am<br>Sondhi Puja: 2:32 am – 03:20 am |
| 8(f) | **Nobomee Puja** | **17 Oct** (30 Ashwin)<br>Sun rise 7:34 am & set 6:30 pm | Wednesday | Nobomee till 05:01 am of next day<br>Puja: 9:00 am |
| 8(g) | **Bijoya Doshomee** | **18 Oct** (31 Ashwin)<br>Sun rise 7:35 am & set 6:29 pm | Thursday | Doshomee till 07:06 am of next day<br>Puja : 10:00 am |
| 9 | **Kojagori Laxmi puja** | **23 Oct**. (05 Kartik)<br>Sunrise 7:41 am & set 6:21 pm | Tuesday | Purnima till 12:41pm of next day.<br>Puja: Evening |
| 10 | **Shyama (Kali) Puja** | **06 Nov**. (19 Kartik)<br>Sunrise 6:59 am & set 5:01 pm | Tuesday | Omabosya till 10:45 am of next day<br>Puja: Night |
| 11 | **Jogodhatri puja** | **16 Nov** (29 Kartik)<br>Sunrise 7:12 am & set 4:51 pm | Friday | Novomee till 10:34 pm |
| 12 | **Rasleela of Lord Krishna** | **22 Nov** (05 Ogrohayon)<br>Sun rise 7:20 am & set 4:46 pm | Thursday | Purnima till 01:11 am of next day.<br>Puja: Day and Night |
| 13 | **Mokor Sonkranti / Poush Parbon & Pittha festival** | **15 January** (30 Poush)<br>Sun rise 7:48 am & set 5:06 pm | Tuesday | Last day of the month of Poush<br>Puja: morning. Pittha Utsob: Evening |
| 14 | **Saraswati Puja** | **09 February** (25 Magh)<br>Sunrise 7:24 am & set 5:39 pm | Saturday | Sukla Ponchomi till 11:55 pm<br>Puja: 10:00 am |
| 15 | **Shiva Ratri Broto** | **04 March** (19 Falgun)<br>Sunrise 6:49 am & set 6:09 pm | Monday | Choturdoshee till 08:12 am of next day<br>Puja: Night |
| 16 | **Doljatra & Gour Purnima** | **20 March** (05 Choitra)<br>Sunrise 7:21 am & set 7:29 pm | Wednesday | Falguni Purnima till 09:54 pm<br>Puja: Night |
| 17 | **Basanti Oshtomi & Onnopurna Puja** | **12 April** (28 Choitra)<br>Sun rise 6:40 am & set 7:57 pm | Friday | Oshtomee till 10:58 pm<br>Puja: morning |
| 18 | **Ram Nobomi** | **13 April** (29Choitra)<br>Sun rise 6:38 am & set 7:58 pm | Saturday | Novomee till 08:43 pm<br>Puja: morning |
| 19 | **Chaitra Sonkranti** | **14 April** (30 Choitra)<br>Sun rise 6:36 am & set 7:59 pm | Sunday | End of the year 1425 |

## Sree Sree Baba Lokenath Brohmochary Puja List of Bangla 1425

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tirodhan Dibos** | **03 June** (19 Joisttho) | Sunday | Puja : Evening |
| 2 | **Prodeep Utsob** | **03 Nov**. (16 Kartik) | Saturday | Puja : Evening |
| 3 | **Paduka Utsob** | **25 February (12 Falgun)** | Monday | Puja : Evening |